



“পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে” গ্রন্থমালা

# মহারাষ্ট্র

বহুবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা ।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু.

প্রণীত

প্রিন্সিপাল পাব্লিশিং হাউস

১৯৭ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রকাশক—ত্রিভাষিকবিদ্যার যিহ্ন বি-এ

বিভিন্ন শাসনিকি হাউস

১১৭ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,

কলিকাতা—

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

মূল্য ১ মূল্য ২ টাকা

প্রিন্টার—ত্রিভাষিকবিদ্যার গান

মেট্রিকাল প্রেস

১৫ নং নরানচাঁদ বস্ত্র স্ট্রিট, কলিকাতা

## বক্তব্য

ছেলেদের জন্য চিত্র ও গল্প মিশাইয়া ইতিহাস লেখা বড় কঠিন কাজ। এ টিক বেন মহোৎসবের মোহনভোগ প্রস্তুত করা। হুজী, চিনি, কিশ্মিশ্ অর্থাৎ ইতিহাস, গল্প ও চিত্র তিনটিই পরিমাণ মত দিতে হইবে—খুব বুঝিয়া-সমুঝিয়া; একটু কমবেশীতে হয় ত মস্ত জগৎ তৈয়ারী হইয়া যায়; ভোক্তার নিকট তেমন তৃপ্তিকর হয় না। স্নাতকের কলকটা আপাততঃ উহা রাখিয়াই সেলাম। কেন্দ্র-বিশেষে অবশ্য তাহার পরিমাণ ও উৎকর্ষের তারতম্য ঘটে।

বজ্র-বাড়ী ভাল; মাল-মশস্তার অভাবও নাই। ছুঃখের মধ্যে কেবল অগট্ট পাচক। মহারাষ্ট্রীয় হুজী দিয়া বাবলা দেশের রসনার উপযোগী মোহনভোগ প্রস্তুত করা যে-সে পাচকের কাজ নহে। বাহাহউক, প্রকাশকের নিকট যখন শোনা গেল যে, এই সিরিজের বইগুলি শুধু হুকুমারমতি ছেলে-মেয়েরাই পড়ে না, তাহাদের অভিভাবকগণও এগুলির দ্বারা সুবসর-বিনোদন করিতে ভালবাসেন, তখন বইখানিকে সকল দিক দিয়া উত্তর শ্রেণীর পাঠকের মনোজ্ঞ করিবার জন্য কিছু বক্তৃতা লইতে হইল। সেইজন্য ইতিহাসের মাল-মশালা একটু বেশী সংবদ্ধ করিয়া, মিষ্টত্বের ভাগ কিকিং লঘু করিতে হইয়াছে।

চিত্র ও গল্পকে প্রাধান্য দিতে গিয়া অনেক সময় বাধ্য হইয়া হুল ইতিহাসকে খাটো করিয়া ফেলিতে হয়। মহারাষ্ট্র দেশ সম্বন্ধে তাহা করা চলে না—বিশেষতঃ যাহার ইতিহাসের অর্ধেকটাই শিবাজীর মত একটা বিরাট চরিত্র জুড়িয়া রহিয়াছে। ইতিহাসখানিকে সংক্ষেপের মধ্যেও বহুমান্য প্রামাণিক করিবার জন্য ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সকল মহাজনেরই সাহায্য লাগিয়া হইয়াছে। চিনি ও কিশ্মিশ্ তাই বলিয়া একেবারে কম পড়ে নাই! ইতি—

কলিকাতা।  
কার্ত্তিকী নবমী, ১৩৩২। }

শ্রীমদ্রামকৃষ্ণ বসু।

## সূচিপত্র

|                                             |     |     |     |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ১ম অধ্যায়—দেশ ও জাতির পরিচয়               | ... | ... | ১   |
| ২য় " বিচ্ছিন্ন প্রাচীন ইতিহাস              | ... | ... | ১০  |
| ৩য় " রাষ্ট্রকূট ও কল্যাণের চালুক্য বংশ     | ... | ... | ১৭  |
| ৪র্থ " দেবগিরির শাসন-বিভাগ ও সমাজ-ব্যবস্থা  | ... | ... | ২২  |
| ৫ম " মুসলমান আমলে বাদব রাজবংশ               | ... | ... | ২৮  |
| ৬ষ্ঠ " বাহ্মানী সাম্রাজ্য                   | ... | ... | ৩৫  |
| ৭ম " আহমেদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা          | ... | ... | ৪৬  |
| ৮ম " মুঘলযুগে মহারাষ্ট্র                    | ... | ... | ৫৬  |
| ৯ম " স্বাধীনতার বীজ-রোপণ                    | ... | ... | ৭২  |
| ১০ম " শিবাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম             | ... | ... | ৮১  |
| ১১শ " ছত্রপতি শিবাজী                        | ... | ... | ১০৪ |
| ১২শ " শিবাজীর রাজ্য-শাসন-প্রণালী ও শেষ জীবন | ... | ... | ১২৬ |
| ১৩শ " শিবাজীর বংশধরগণ                       | ... | ... | ১৩৬ |
| ১৪শ " পেশ্‌ওয়ার-শাসন                       | ... | ... | ১৪৬ |
| ১৫শ " জীবন-সঙ্ক্যার                         | ... | ... | ১৬২ |





ছত্রপতি শিবাজী ।

[ প্যারিসের Bibliotheque Nationale  
রক্ষিত একখানি প্রাচীন তৈল চিত্র হইতে ]

# মহারাষ্ট্র

## প্রথম অধ্যায়

### দেশ ও জাতির পরিচয়

কোন জাতির ইতিহাস জানিতে হইলে, প্রথমে তাহার দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে হয়। তাই মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাস আরম্ভ করিবার পূর্বে তোমাঙ্গিকে একবার ভারতের মানচিত্রখানি খুলিয়া দেখিতে বলিব।

চাহিয়া দেখ, ভারতের বুকের মধ্য দিয়া পূর্ব দিকে মহানদী ও পশ্চিম দিকে নর্মদা নদী প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণে যে বিরাট ভূখণ্ড পড়িয়া আছে, তাহার নাম দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ। দক্ষিণাপথ অনেকটা ত্রিকোণাকার; ইহার পূর্ব ও পশ্চিম তীর ঘেঁষিয়া দুইটি প্রকাণ্ড পর্বতশ্রেণী, প্রসারিত বাহুর মত বিস্তৃত হইয়া, সুদূর দক্ষিণে নীলগিরি পর্বত পার্শ্বে আসিয়া শেষ হইয়াছে। পর্বতমালার একটির নাম পূর্বঘাট, অণ্ডটির নাম পশ্চিমঘাট বা মহালি।



সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকে কুকুরের জিহবার মত এক প্রলম্বিত ভূমিখণ্ড পড়িয়া আছে ; উহার নাম কঙ্কন। সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকে বহু ক্ষুদ্র পর্বতমালা উদ্ভব-লাভ করিয়া স্থানটিকে যেন পঙ্কজের মত করিয়া রাখিয়াছে। এই শাখা পর্বতমালার সর্বোত্তরেরটির নাম চন্দ্রমালা, সর্বদক্ষিণেরটির নাম মহাদেও পর্বত। প্রাচীনকালে মহারাষ্ট্র জাতির জন্ম হয় কঙ্কনে ও সহ্যাদ্রির এই শাখা-পর্বতগুলির উপত্যকার মধ্যে।

তারপর কালক্রমে এই পার্বত্য শিশু বৃদ্ধি পাইয়া, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। অবশেষে তাহার প্রতাপ এত বাড়িয়া পড়ে যে, অর্ধ ভারতেও তাহার স্থান সঙ্কুলান হইল না ; তাহার দাপটে ভারতের স্বদেশী বাদশাহ ও বিদেশী রাজ্য-জয়ীর দল বরহরি কাঁপিতে লাগিল।—দেখ ইতিহাসের কথা—পরে বলিব।

এখন মহারাষ্ট্র দেশের মোটামুটি একটা চৌহদ্দী তোমাদিগকে জানাইয়া দিই। উত্তরে সাতপুরা ও গোয়ালগড় পর্বতমালা ; পূর্বে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পশ্চিমাংশ ও মাদ্রাজ প্রদেশের কিয়দংশ ; দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী ও দক্ষিণ কানারা ; এবং পশ্চিমে আরব্য সাগর। মহারাষ্ট্র দেশের প্রায় সমস্তটাই বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত। নিজামের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সমস্ত পূর্বাংশই মহারাষ্ট্রদের বাস। মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, মিউনি ও জব্বলপুরের সমস্ত পূর্বভাগেও মহারাষ্ট্রীয়ের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ত্রোচ, সুরাট ও রাজপীপ লি প্রভৃতি কয়েকটি জেলা ছাড়া সাতপুরা ও

বিশ্বা পর্বতের মধ্যবর্তী বেশীর ভাগ স্থান, এমন কি বিশ্বের উত্তরে কয়েকটি জায়গা এবং বেরারের অধিকাংশ মহারাষ্ট্র জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত।

কখন বেশটি সমুদ্র-জল-রেখা হইতে সহ্যাদ্রির পাদদেশ পর্বন্ত চওড়ায় পঁচিশ হইতে ত্রিশ মাইলের বেশী হইবে না ; দুই চারি জায়গায় বড় জোর পঞ্চাশ মাইল হইবে। কঙ্কনের অধিকাংশ ভাগই সমতল নহে। সহ্যাদ্রির পূর্ব দিকের ভূমিখণ্ড যে কতখানি অসমতল, তাহা তোমরা মানচিত্রখানির উপর একবার চক্ষু বুলাইলেই বুঝিতে পারিবে। দেশটি একেবারে পর্বতে পর্বতে ভরা। অবশ্য পশ্চিমবাট পর্বতের উপর কতকগুলি বেশ প্রশস্ত মালভূমি আছে ; ঐ গুলিকে নারায়ীরা 'বাট নাখা' বলে। মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বে কতকটা জমি বেশ সমতল ও উর্বর দেখা যায়। এইখানে তুলা উৎপন্ন হয়। দুই শাখা-পর্বতের মাঝে মাঝে খানিকটা করিয়া উপত্যকা-ভূমি আছে, তাহাও বেশ উর্বর। উহাতে ধান্য, জোনার প্রভৃতি ফসল ধলে।

সহ্যাদ্রির অধিকাংশ ভাগই ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফুট উচ্চ এবং দুরারোহ। আদুল পর্বতগাত্র নানারূপ কুঙ্কলতাপূর্ণ গভীর জঙ্গলে আবৃত। জঙ্গলে বায়-ভালুকের অভাব নাই। পর্বতগাত্র দিয়া অসংখ্য সরিৎ ও ঝর্ণা অবিরাম বহিতেছে। এক এক স্থান কুঙ্কলতাবিরল ও জনমানবশূন্য। উক্ত ভারতের মত মহারাষ্ট্রদেশ শস্তাশ্রমল ও ফল-ফসলে সমৃদ্ধ নহে। তবুও ব্রহ্মদেশের ছাত্র ইহার জলবায়ু বেশ উপভোগ্য ও অনেকটা অপরিবর্তনশীল। বর্ষাকালে

এখানে প্রচুর বারিধরণ হয় ; তখন পার্বত্য দৃশ্য সত্যই অতুলনীয় ।

ক্ষুদ্র নদীর অভাব মহারাষ্ট্রদেশে নাই । পনেরো কিম্বা মাইল রাস্তা চলিতে গেলেই একটা না একটা স্রোতস্বতী পার হইতে হয় । এক দিকে প্রচুর পাহাড়ের ভীষণ কঠোরতা, অন্য দিকে বহুল প্রবাহিণীর মনোরম স্নিগ্ধতা—অপূর্ব সম্মিলন ! অধিবাসীদের দেহগুলিও হইয়াছে পর্বতের ভায় কষ্টসহিষ্ণু, হৃদয়গুলিও হইয়াছে নদীর মত সরস ও প্রাণপূর্ণ । সহ্যাদ্রি ও উহার শাখা-গিরিগাত্র হইতে ভীমা, নীরা ( অথবা সীমা ), কৃষ্ণা, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি বড় বড় নদী জন্মলাভ করিয়াছে ; তন্মধ্যে শেষের তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সর্বোত্তরে বিরাটকান্না তাপ্তী নদী তাহার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়া বৈরাট প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সুরাটের কোল ছুঁইয়া সাগরে পড়িয়াছে । নীরা ও যোনী নামক ক্ষুদ্র নদী দুইটির উত্তর তীরের ভূভাগ প্রসিদ্ধ মারাঠী ঘোটকের জন্মস্থান । গোদাবরী নদী—দাক্ষিণাত্যের গঙ্গাস্বরূপা ; মারাঠী হিন্দুরা ইহার জলকে সুপবিত্র জ্ঞানে পূজা করেন ।

সমগ্র মহারাষ্ট্রদেশের আয়তন প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল ; অধিবাসীর সংখ্যা কিঞ্চিৎ কম দুই কোটি । অধিবাসীদের শতকরা আশী জনই হিন্দু । বাকী ভাগ মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্শ্বভ্যক্তি । মানচিত্রখানির প্রতি আবার দৃষ্টিপাত কর । জুর্নীর (জুম্মার) নামক একটি স্থান পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ঠিক মাঝামাঝি

দেখিতে পাইতেছি কি ? জুনির হইতে দক্ষিণে কোলাপুর শহর পর্য্যন্ত যে মালভূমি ও পার্বত্য ভূখণ্ডসকল আছে, তাহার মধ্যে বহু সংখ্যক মাওয়ালী, খোরা ও মুরা নামক তিনটি পার্বত্য জাতি বাস করে। ইহাদের মধ্যে মাওয়ালী জাতির নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহারা যেমন কন্টনহিঙ্গু, তেমনি সাহসী ও দুর্ভীক্ষ। শিবাজীর জীবন-কথায় ইহাদের কথা বিশেষভাবে জানিতে পারিবে। জুনির হইতে উত্তরে সাতপুরা পর্বতমালার সামুদ্রিক পর্য্যন্ত কোল ও ভৌলদের বাসভূমি। ইহারাও পুর যুদ্ধপ্রিয়; নীকারে ও লুণ্ঠনে সমান ওস্তাদ।

মহারাত্রিগণ আর্য ও দ্রাবিড় মহাজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অনেকেরই ধারণা। প্রথমতঃ সুরাষ্ট্রের শূরাজগণ উত্তর মহারাত্রি জয় করিয়া লইয়া, অবাধে কিছুকাল পর্য্যন্ত দেশবাসীর সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান করে। শক্, ইউচি প্রভৃতির সাহিত আঁধারকুট মিশিরা রাজপুত জাতির স্রষ্টি; সেই রাজপুত জাতির রক্তও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট মিশিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাহা ছাড়া, যদি পৌরাণিক উপকথার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ষাঁটি আর্য জাতির সহিত পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দ্রাবিড়দের যথেষ্ট সাক্ষর্য্য ঘটিবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

উত্তরভারত নিষ্কৃত্রিয় করিবার পর, ব্রাহ্মণ পরশুরাম গোকর্ণ তীর্থ-দর্শনে আসেন। এই গোকর্ণ বর্তমান বেঙ্গলার দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া জানা যায়। তারপর তিনি ঋষি অগস্ত্যের

রক্ত পশ্চিমঘাটে একটি আর্ঘ্য উপনিবেশ ও সভ্যতার প্রবর্তন করেন। কালক্রমে এই সভ্যতার একটি মহামিলন ঘটিয়া, সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র জাতির জন্মদান করিয়াছে। তবে ভাষার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, ইহাদের ত্রাবিড় রক্তের প্রাবল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। কারণ ইহাদের ভাষা পক্ষ ত্রাবিড়ী ভাষার অন্ততম।

মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুগণ পুরাকালের আক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ও বটেই; তাহা ছাড়া বাংলা দেশের ক্ষত্র-বহু দক্ষর জাতিও ইহাদের সমাজে উৎপন্ন হইরাছে। আক্ষণদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে; বেশীর ভাগই রাজপুত্র-জাত; বাকী কায়স্থ নামে পরিচিত। শূদ্রদের মধ্যে অধিকাংশই চাষাবাদ করে; ইহুদিগকে ‘কৃন্দী’ বলা হয়। বিয়ু ও মহাদেব উভয় শ্রেণীর ভক্ত-সম্প্রদায়ই মহারাষ্ট্রে বর্তমান।

উত্তর ভারতে মুসলমান ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের যেমন চির-সংঘর্ষ চলিয়াছিল,—কোন সময় বা হিন্দুধর্ম মুসলমান ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কখনও বা ইসলামধর্ম হিন্দুধর্মকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে; ঠিক তেমন ব্যাপারটি কিন্তু মহারাষ্ট্রে দেশে হয় নাই। একে ত মহারাষ্ট্রে দেশ মুসলমান রাষ্ট্রীয় শক্তির অধীনে খুব অল্পকালই ছিল, তত্পরি এই ধর্মের যেটুকু সারাংশ—তাহা মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুধর্ম আপনার মধ্যে সহজ আনন্দের সহিত জীর্ণ করিয়া লইয়াছে। মুসলমান আগমনের পূর্ব হইতে এখানে সমাজের উপর আক্ষণদের একাধিপত্য কখনও ছিল না। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে

সম্প্রদায়ে কচিৎ বিবাহ-বিলম্ব বা রেখারেখি ছইয়াছে । শুল্কজাত শাধু ও মহাপুরুষকেও মহারাত্রীর আশ্রয়গণ ভক্তি করিতে ক্রোধী করেন নাই । বৈশ্য রাজার জন্ত ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণ অকাঙ্ক্ষিত প্রাণবলি দিতে কাৰ্পণ্য করেন নাই ।

মহারাত্রীর রমণীদের মধ্যে ঘোমটা বা পর্দা-প্রথা নাই ; দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থানের ছায় সেখানে অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা বিদ্যমান । দুই শতাধিক বর্ষকাল মুসলমান সভ্যতার আবাবহিত পার্শ্বে থাকিয়াও তাহারা রমণীর অবরোধ-প্রথাটি অনুকরণ করেন নাই । অবশ্য রাজা, মহারাজা, সভাসদ ও উচ্চশ্রেণীর সেনাধ্যক্ষগণ স্বীয় পরিবারের মধ্যে পর্দা-প্রথা কতকটা মানিয়া চলিতেন । পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার ; পুরুষ নারীকে তাহার দাসী বলিয়া দেখে না—দেখে সহচরী ও মন্ত্রী বলিয়া । ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রাজপুত্র রমণীর চেয়েও তেজোবীর্য্যে মারাঠা রমণীগণ অধিকতর অগ্রণী । বর্তমানে শিক্ষা বিষয়েও মারাঠা রমণীগণ অত্যন্ত উৎসাহশীল । বস্তুতঃ কেবলমাত্র মেয়েদের জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশেই ( পুণায় ) সম্প্রতি গড়িয়া উঠিয়াছে ।

মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাতন শহর পুনা । বর্তমানে ইহা বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের গ্রাম্যকালীন রাজধানী । এখানে ইংরাজ সৈন্তের প্রকাণ্ড বাঁটি আছে । বহুকাল ধরিয়া পুনা নগরী পেশওয়াদের রাজধানী ছিল । বম্বাই নগর পুনার

উত্তরপশ্চিমে কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া গঠিত বন্দর ; ইহাও মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত । ব্রিটিশ শাসনের প্রাকালেই ইহার প্রাধান্যের সূত্রপাত হয় । শহরের প্রায় বারো লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ গুজরাতী ও পার্শী বণিক এবং নানা দেশীয় কর্মচারী সম্প্রদায় ; উল্লিখিত সংখ্যা হিসাবে কচ্ছী, পাঠান ও মারাঠীদের স্থান । পুণা শহরের প্রায় ঘাট মাইল দূরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে, বোম্বাই শহরে প্রবেশ করিবার পথে কল্যাণ নামক প্রাচীন শহর অবস্থিত । ইতিহাস পড়িবার সময় আশা-দিগকে বহুবার কল্যাণকে স্মরণ করিতে হইবে ।

মহাবালেশ্বর আমাদের দেশের দার্জিলিংয়ের মত । পূর্বে গভর্ণারগণ গ্রীষ্মের বেশীর ভাগ এখানেই কাটাওয়া যাইতেন । সাড়ে চারি হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে শহরটি অবস্থিত । আহমেদনগর পুণা শহরের উত্তরপূর্বে অবস্থিত । ইহার চারিপার্শ্ব দিয়া একটা প্রতাপশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল । পুণার মাইল ঘাটেক দক্ষিণে সাতারা নগর । ইহাও কিছুদিন মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কেন্দ্রভূমি ছিল । উহার মাইল বাটেক দক্ষিণে কোলাপুর শহর । তাহার নব্বই মাইল দূরে ঠিক পূর্ব দিকেই প্রাচীন বিজাপুর নগর । ইহাকে ঘেরিয়াও একটা প্রকাণ্ড মুসলমান রাজ্য মাধা তুলিয়া দিল্লী-সম্রাটের রক্তচক্ষুকে একদিন উপেক্ষা করিয়াছিল । বিজাপুরের প্রাচীন সৌধ, তোরণ, প্রাসাদ ও মসজিদগুলি এখনও পর্যটকের বিশ্বাসের উপাদান যোগাইতেছে । উহার প্রত্যেকটার সহিত এক একটা ইতিহাস

জড়িত। পরে প্রসঙ্গক্রমে আহ্মেদনগর ও বিজাপুরের বিশদ পরিচয় দিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত, হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ নাসিক ও পঙ্করপুর, তুলার বিরটি গঞ্জ ছব্‌লী, বেল্‌গাম, শোলাপুর ও ষাড্‌ওয়ার, রাজপুর, জিঞ্জীরা বন্দর প্রভৃতি স্থানগুলিও মানচিত্রে একবার দেখিয়া রাখা ভাল; হয়ত ইতিহাস পড়িতে পড়িতে পাঠককে অল্পবিস্তর এই সকল নামের সম্মুখীন হইতে হইবে।



## দ্বিতীয় অধ্যায়

### বিচ্ছিন্ন প্রাচীন ইতিহাস

এক হাজার বৎসর আগেকার মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে বড় বেশী খবর আমরা পাই না। 'গুর্নী' বলিয়া এখনও একটা নিম্নশ্রেণীর জাতি মহারাষ্ট্রের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বেশ সূর-স্বর ও বাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। লোকপ্রবাদ ও কিংবদন্তী দ্বারা যতখানি জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই গুর্নীরাই মহারাষ্ট্রের আদিম অধিবাসী। তাহার পর কোল, ভীল প্রভৃতি পার্শ্বীয় জাতিরা তু ছিলই। ইহারা সকলেই অনাৰ্য্য জাতি। উত্তরভারতে আৰ্য্যজাতির প্রাধান্য-কিন্তুারের সময়, জ্রাবিড় ও তাঁহাদের মধ্যে বহু কালব্যাপী যে যুদ্ধ চলে, তাহার ফলে বহু জ্রাবিড় নর্মদা ও তাপ্তা নদীর দক্ষিণে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। আৰ্য্যগণ ঈর্ষাবশতঃ ইহাদিগকে অনাৰ্য্য-রাক্ষস বলিয়াছেন বটে; কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে এবং চুগোপযোগী নভ্যতায় জ্রাবিড়গণ যে আৰ্য্যগণ অপেক্ষা খুব নীচে ছিলেন, একথা কিছুতেই বলি চলে না।

অনুমান করিয়া বলা যায় যে, মহারাষ্ট্র দেশ তখন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা জনপদে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জনপদের একজন করিয়া সর্দার বা নেতা ছিলেন। ইহাকে রাজ্য বলিলেও ক্ষতি নাই, তবে মধ্যযুগের রাজ্যের ন্যায় ইহারা যথেষ্টাচার

করিতে পারিতেন না। এই ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের মধ্যে একটি রাজ্য বোধ হয় খ্রীষ্ট জন্মাব্দে দুই শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে বেশ একটু প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার বিখ্যাত রাজধানী তাগারার নাম সমসাময়িক গ্রীক ইতিহাসেও স্থান লাভ করিয়াছে।

তারপর খ্রীষ্ট জন্মের শত বার্ষিক বৎসর পূর্বে শালিবাহন নামক এক রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি শুধু উত্তর মহারাষ্ট্রে নহে, পশ্চিমে অন্ধ্র, রাজ্যের কিয়দংশও গ্রাস করিয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বা উপকথা মহারাষ্ট্রে বেশে প্রচলিত আছে; তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটা আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। যাহা হউক, শালিবাহনের পূর্বে দক্ষিণাত্যের পূর্বভাগে গোসাবরী ও কাবেরী নদীর মধ্যস্থলে অন্ধ্রজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্ট জন্মাব্দে দুই শতাব্দিক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পরে, অন্ধ্রগণ মহারাষ্ট্রে দেশ অধিকার করিয়া লইয়া, তাহাদের রাজ্যের দুই সীমা দুই সাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে ক।

শালিবাহন খুব ছোট ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন— তিনি কুন্বীর (চাঘার) ঘরে, কেহ বলেন—তিনি কুমারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলেন, তিনি ব্রাহ্মণ বংশজাত। তাহার মাতা কুমারী অবস্থায় এক সপ্নরূপী দেবতার রূপায় গর্ভবতী হন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে কন্যাকে

\* "Student's History of India"—Smith, p. 70.

গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। এক কুস্তকার সেই আসন্নপ্রসবী  
ত্রাণ-কন্ধ্যাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন। এইখানেই শালিবাহনের  
জন্ম ও বাল্য জীবন-যাপন।

শালিবাহন ক্রমশঃ বড় হইয়া মহাবলশালী যোদ্ধায় পরিণত  
হইলেন। তাঁহার বিজ্ঞা-বুদ্ধি হইল যেমন অসাধ, রাজ্যজয়ের  
ইচ্ছা হইল তেমনি অনন্ত। নর্মদা নদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত রাজ্যকে  
পরাস্ত করিয়া, তিনি দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত আপন  
আধিপত্য বিস্তার করেন। শালিবাহন প্রীতিস্থানে তাঁহার  
রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাকেই গ্রীক পেরিপেলাস্ ‘পাইথান’  
নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমে গোদাবরীর তীরে  
এখনও পৈধান বলিয়া একটি ক্ষুদ্র নগর দেখা যায়। তিনি সূৰ্য্য-  
বংশীয় অশ্বশীর নামক স্থানের অধিপতিকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং  
তাঁহার পরিবারের সকল স্ত্রী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

কেবল একটিমাত্র গর্ভবতী মহিলা শান্তপুরা পর্বতের এক দুর্গম  
স্থানে গিয়া কোন ভীলের কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।  
তাঁহার গর্ভে যে সম্ভবান জন্মে, তাহারই পরপুরুষগণ নাকি চিতোর  
ও উজ্জপুরের বিখ্যাত রাণাবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শালিবাহন  
মালবরাজ বিক্রমজিতের সহিত বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।  
পরে সম্মানজনক সন্ধি উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। ষ্টি পূঃ ৭৮  
সালে শালিবাহন এক নূতন অঙ্ক প্রচলিত করেন। ঠিক ঐ  
সালেই উত্তর ভারতে কুশান বংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় ক্যাজ্‌কাইসেন্স-  
এর অভিষেক-সময়ে শকাব্দও প্রচলিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, অন্ধ্রগণ পরাক্রান্ত হইয়া মহারাষ্ট্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া নইয়াছিল। অন্ধ্রদেশে যে রাজবংশের প্রায় বত্রিশজন রাজা ২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম সাতবাহন বংশ। ইঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ভায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিতেন বলিয়া ইঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। ইঁহাদের ধানুকটক নামক স্থানে রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ অন্ধ্রদেশীয় এই সাতবাহন বংশীয় কোন রাজাকেই শালি-বাহন পরাস্ত করিয়া, মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন।

ইহার পর শক ও ইউটি উত্তর ভারতের অধিকাংশ জয় করিয়া নইয়া এক বিরাট রাজ্য পত্তন করেন। ইউটিদের প্রসিদ্ধ দ্বিধিজয়ী রাজা ছিলেন কুষাণবংশীয় কনিষ্ক। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা দেখিতে পাই যে, মালব, গুজ্জর, মিথিলা ও সুরাষ্ট্রে চারিজন স্বাধীন শাসনকর্ত্তা পুরুষপুর বা পেশোয়ারের কেন্দ্রীয় শব্দ-সম্রাটের প্রতিনিধি-স্বরূপ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই শাসন-কর্ত্তাদের উপাধি ছিল ক্ষত্রপ (satrap),—এখন ইংরাজীতে ‘গভর্নর’ বলিলে যাহা বুঝি। কিছুকাল উত্তর-মহারাষ্ট্রও শকদের অধীন ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রথম ক্ষত্রপের নাম ছিল নাহাপনা। ইনি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছিলেন \*।

শক বা কুষাণদের সহিত অন্ধ্রদের বরাবরই যুদ্ধ-বিগ্রহ

\* “ভারতবর্ষের ইতিহাস”—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; ৩য় পৃষ্ঠা।

চলিতেছিল। তারপর সমগ্র ভারতে কুষাণবংশীয়দের আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে, অন্ধ্রের ক্ষতগৌরব কতকটা ফিরিয়া আসিল বটে; কিন্তু বিখ্যাত মাত্তবাহন বংশের চিরতরে পতন হইল। ইহার পর প্রায় তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস একেবারে নীরব। তারপর ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রীয় চালুক্যবংশ দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। ইহারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতেন।

চালুক্যগণ প্রতাপশালী হইয়া ক্রমশঃ উত্তরে, দক্ষিণে ও পূর্বে তাঁহাদের অধিকার-সীমার বিস্তার করিতে লাগিলেন। এমন সময় পল্লবদিগের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পল্লবগণ পঞ্চম শতাব্দীতেই কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যভাগে পূর্বসমুদ্র-কূল ঘেঁষিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের দুইটি রাজধানী ছিল, একটি পশ্চিমে বাতাপীনগর বা বাদামী এবং অন্যটি পূর্বে কাঞ্চী (মাত্রাজ শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে বর্তমান 'কম্পীভরম')। পল্লবদের সময়েই অনেক বড় বড় দেব-মন্দির কাঞ্চীতে নিৰ্ম্মিত হয় এবং উহা অন্যতম মহাতীর্থ বলিয়া ঘোষিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতের প্রাধান্ত লইয়া চালুক্য ও পল্লবদিগের মধ্যে মারামারি বেশ পাকাইয়া উঠিল। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য পল্লবদিগের পূর্বদিকস্থ রাজধানী কাঞ্চীনগরী আক্রমণ ও অবরোধ করিয়া বসিলেন। অবশেষে পল্লবগণ রাজধানীর সিংহদরজা খুলিয়া দিয়া, তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ বিক্রম কাঞ্চীর

কোন কতিসাহন করেন নাই; উহার দেবমন্দিরগুলি অক্ষয় রাখিয়াছিলেন।

তারপর চালুক্যরাজ্য পুলকেশী পল্লবদের পশ্চিমদিকস্থ রাজধানী বাদামী ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া ধ্বংসরূপে পরিণত করেন। উহার নিকট তাঁহার নূতন রাজধানী তৈয়ারী হয়।

তাঁহার বংশধর দ্বিতীয় পুলকেশী মহাপরাক্রান্ত ছিলেন; তাঁহার রাজত্বের নীচে সমস্ত দক্ষিণী নৃপতিগণ মাথা নোয়াইয়াছিল। উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট তখন রাজা হর্ষবর্দ্ধন,—তাঁহার জয়যাত্রিতে তখন আকাশ-বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পুলকেশী এক বিরাট বাহিনী লইয়া কোণ্ডোমগুল (বর্তমান নিজাম রাজ্যের পশ্চিমাংশ) অতিক্রম করিয়া, কলিঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্যসলকে ভীষণভাবে পরাস্ত করিয়া, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর তাঁহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইলেন (খ্রিস্টাব্দ ৬২০ খৃঃ)। তারপর তিনি হর্ষের মহিমা ঘন করিয়া দিয়া মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। পল্লবদের প্রতিবেশী চোল, চের (কেরুল) ও পাণ্ডা রাজাদেরও তিনি শাস্তা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোঙ ইহার রাজসভায় কিছুদিন ছিলেন; তিনি পুলকেশীর রাজাশাসন ও তাঁহার কীর্তিকাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু পল্লবগণ দ্বিতীয় পুলকেশীর অধীনতা বেশীদিন স্বীকার করিয়া চলিল না। কয়েক বৎসর পরে পল্লবরাজ নরসিংহ বর্ম্মা

যুদ্ধ পুলকেশীকে কেশে ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে টানিয়া আনিলেন। যুদ্ধে পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী শত্রুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। কিছুদিন পরে পুলকেশীর সুযোগ্য পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমান্তি পল্লবদিগের উপর প্রাণ তরিয়া প্রতিশোধ লইলেন এবং চালুকাদের বিজয়লক্ষ্মীকে স্বীয় রাজধানীতে পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চালুক্যগণ নির্ভাবনায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তারপর রাষ্ট্রকূটগণের আভ্যুদয় হইল।

---

## তৃতীয় অধ্যায় ।

### রাষ্ট্রকূট ও কল্যাণের চালুক্য বংশ ।

প্রাচীনকাল হইতেই মহারাষ্ট্রে দেশে 'রট্টা' নামক এক জাতির বসতি ছিল । ইহারা দ্রাবিড় জাতি তাহাতে আর সন্দেহ নাই । কিন্তু আৰ্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, যখন মহারাষ্ট্রে চতুৰ্ণ বিভাগের প্রয়োজন হইল, তখন রট্টাগণের অধিকাংশ ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে উন্নীত হইল । পরবর্তী কালে রট্টাগণ যখন প্রতাপশালী হইলেন, তখন আপনাদিগকে মহারট্টা বলিয়া প্রচার করিলেন । মহারট্টা হইতে সংস্কৃতে 'মহারাষ্ট্র' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । ঋগ্বেদীয় মণ্ডম শতাব্দীতে মহারট্টাগণের এক সর্দার রাষ্ট্রকূট রাজবংশের পত্তন করিলেন । ইহারা তাম্রশাসনে আপনাদিগকে 'রাষ্ট্রকূট ও বহুবংশীয় ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন \* । এই জন্ত ইহাদের বহু ব্যক্তির নামের সহিত কৃষ্ণ-নাম সংযুক্ত ।

মহারট্টাগণকে মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের সময়েও ( খৃঃ পূঃ ২৫০ ) তাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরে ও সাতপুরা পর্বতমালার প্রান্তভাগে দেখিতে পাওয়া যায় । ঋগ্বেদীয় মণ্ডম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট বংশ বর্তমান হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ ভূমি

---

\* "Early History of the Deccan"—R. G. Bhandarkar.



অধিকার করিয়া, একটি শক্তিশালী রাজ্য-গঠনের সূত্রপাত করিলেন। ইহাদের রাজধানী হইল মাল্যঙ্কেত। বর্তমান নিজাম-রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদের অনতিদূরে মাল্যঙ্কেত নামক গুপ্তগ্রামখানি এখনও রাষ্ট্রকূটরাজদের সেই প্রাচীন রাজধানীর নাম বহন করিয়া আসিতেছে। মাল্যঙ্কেতের প্রতিষ্ঠাতার নাম দস্তিবর্ম্মা। নিজাম-রাজ্যের ইলোরা নামক পর্ব্বতশৃঙ্খার মধ্যে যে দশাবতার মূর্ত্তি আছে, তাহার নীচে দস্তিবর্ম্মার নাম ক্ষোদিত আছে।

দস্তিবর্ম্মার পূর্ব্বের দুই একজন রাষ্ট্রকূট রাজার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সহিত চালুক্য রাজাদের দুই চারিটি যুদ্ধও হইয়াছিল। ইন্দ্র নামক রাষ্ট্রকূটরাজবর্ষসহস্র সৈন্য ও আট শত রণজন্তীর মালিক ছিলেন; চালুক্যরাজ প্রথম জয়সিংহ তাঁহাকে বহু কষ্টে হটাইয়া দেন।

৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দস্তিবর্ম্মার সুযোগ্য বংশধর দস্তিভূর্গ চালুক্য-বংশের শেষ রাজার সহিত এক প্রকাণ্ড কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিয়া দিলেন। চালুক্য-রাজ যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিলেন। চালুক্য-দিগের সমস্ত রাজ্য রাষ্ট্রকূটরাজ দস্তিভূর্গের পদানত হইল। চালুক্যরাজকে উত্তর কন্ডনের খানিকটা অংশে করদ রাজা করিয়া রাখা হইল। অল্পদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রকূটগণ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের রাজত্ববর্ষী হইয়া উঠিলেন।

এইবার দুই একজন রাষ্ট্রকূট নৃপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

\* "Bombay Gazetteer", Vol. I, part I, p. 120.

দস্তিভূর্গের কোন ছেলেপুলে ছিল না বলিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার খুড়া প্রথম কৃষ্ণ মাল্যক্ষেতের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময় গোড়বংশে পুনঃ পুনঃ অস্থায়ী নৃপতিগণ অভিব্যক্তি করিতেছিলেন। গুর্জর প্রতীহারবংশীয় শ্রীবৎসরাজ কাঞ্চক (বর্তমান কনোজ) জয় করিয়া লইয়া, গোড়বংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র প্রবধারাবর্ষ শ্রীবৎস-রাজকে গোড়বংশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া, নিজেই গোড়বংশ-বিজয়ী নাম ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি কলিঙ্গ ও কোশল রাজ্যগণকেও পরাস্ত করিয়া সম্রাট্ নাম গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত পন্নবগণ কাঞ্চীর চতুর্পার্শ্বে যেটুকু ভূমি লইয়া, তখনও পদ্মাস্ত তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, প্রবধারার সৈন্যদের পদভারে তাহাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রবধারার পুত্র তৃতীয়-গোবিন্দ প্রভুতবর্ষ তারপর মাল্যক্ষেতের সম্রাট্ হন।

এইভাবে তের পুরুষ রাজত্ব করিবার পর রাষ্ট্রকূট বংশীয়দের পতন হইল। ইঁহারা সকলেই বিকৃত ও শিবের উপাসক ছিলেন। ইলোরার প্রসিদ্ধ গুহাসমূহ এককাল বৌদ্ধধর্মের ভাস্কর্য্য ও তক্ষশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সহিত বৌদ্ধধর্মের মহিমা বহন করিতেছিল; রাষ্ট্রকূটগণ সেগুলিকে হিন্দু ভজনালায়ে পরিণত করিয়া, বহু দেবদেবীর মূর্তি ও পৌরাণিক কাহিনী ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন।...

উক্তর কল্পনে চামুকাগণ এতদিন হীনবর্ধ্য সামন্তরূপে

কোনমতে টিকিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই এক বংশ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে নববলে বলীয়ান হইয়া, কল্যাণে রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজ্য-বিস্তারের বিরাট আয়োজন করিয়া বসিলেন। ইহাদের একমূল গুজরাটে গিয়া চণ্ডা বংশীয় সামন্তনিহকে পরাস্ত করিয়া, সেখানকার সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। চণ্ডাবংশীয় রাজারা অনুহিলপত্তন নামক স্থানে তাঁহাদের নুতন রাজধানী পত্তন করিয়াছিলেন। এইখানে চালুক্য-নাগক মূলরাজ রাজা হইয়া ( ৯৪৩ খৃঃ ), সমগ্র গুজরাট ও রাজপুতানার দক্ষিণ-পশ্চিমের ষাটকটা ভূভাগের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকেন।

ইহার বংশধর ভীমদেবের রাজত্ব সময়ে গজনির সুলতান মাহমুদ রাজপুতনার মরুভূমির মধ্য দিয়া অনুহিলপত্তনে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া, দলবল লইয়া সোমনাথের দিকে পলায়ন করিলেন। সেখানে সামন্তরাজাদের জুটাইয়া লইয়া, সুলতান মাহমুদকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হইয়া রহিলেন। তারপর সুলতান মাহমুদ সেখানে পৌছিয়া, হিন্দুদের সহিত তিন দিন ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। সোমনাথের পুরোহিতগণ পর্বস্ত যুদ্ধে যোগ দিলেন ; তাঁহাদের পত্নীরাও অন্দর-মহলের অর্গল্ ভাগিয়া মৃত্যুযুগ্ম যুক্ত রণাঙ্গণে আসিয়া স্বামিপুত্রদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে হিন্দুরা হটিয়া গেলেন। সুলতান কয়েকদিন ধরিয়া সোমনাথের

প্রসিদ্ধ মন্দিরের অশাখ ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পিছু ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই চালুক্যগণ আবার গুজরাটে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন এবং সোমনাথের মন্দির পুনরায় নির্মাণ করিয়া দিলেন। ইহার পর ভীমরাজ ভোজ-  
সেবকে পরাস্ত করিয়া, ধারানগর অধিকার করিয়াছিলেন ; শেষ বয়সে তিনি একবার সিন্ধুদেশেও অভিযান করেন।

কুমার পাল গুজরাতি চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার প্রভাব দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরী গুজরাট আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু কুমারপালের শৌর্যে নিতান্ত শোচনীয় পরাজয়ের , গ্রানি লইয়া ফিরিয়া আসেন। তারপর কুমারপালের উত্তরাধিকারীরা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িলে, মুসলমানগণ পুনঃ পুনঃ গুজরাটের দ্বারে আসিয়া হানা দিতে লাগিলেন। একবার কুৎবুদ্দিন আইবেক বহু নৈম্য লইয়া গুজরাট আক্রমণ করিলে, চালুক্যদের নামন্ত-  
রাজ ও জ্ঞাতি লবণপ্রসাদ ভূমি বিক্রমে তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। তাহার পর লবণপ্রসাদের বংশধরগণই প্রায় শত বর্ষ গুজরাট সিংহাসনের শোভা বর্ধন করেন। অবশেষে আলোউদ্দিন খাল্জীর সময়ে গুজরাটের হিন্দুস্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়। লবণপ্রসাদ প্রথমে ব্যাঘ্রপল্লীর জায়গীরদার ছিলেন বলিয়া তাঁহার কংশ বাঘেলা বংশ বলিয়া পরিচিত। চালুক্য ও বাঘেলা কংশের অনেকেই জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঔহাদের অহিংসা নীতির বাড়াবাড়িই বোধহয় রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের অসুতম কারণ ৬।

এদিকে কল্যাণের অর একদল চালুক্য রাষ্ট্রকূটদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে, ঔহাদের রাজ্য-সীমা একটু একটু করিয়া বাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ৯৭০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় তৈল-চালুক্যের নিকট রাষ্ট্রকূটগণ একেবারে পরাভূত হইয়া, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরকালের জন্য সরিয়া পড়িলেন +। এই সময়ে গোড়বঙ্গে বিখ্যাত সম্রাট্ মহীপাল রাজব করিতেছিলেন। এই নূতন চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন (১০৭৬—১১২৬ খৃঃ অঃ)। তিনি একবার তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্ব-সময়ে, গোড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাঢ়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কতকগুলি রাজ্য জয় করিয়া লন। কিন্তু এই অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। পরবর্তী চালুক্যরাজগণ ক্রমাশঃ হতবল হইয়া পড়েন এবং ষাটশ শতাব্দীর শেষভাগে ঔহাদের প্রাধান্য লোপ পায়।

\* ভারতবর্ষের ইতিহাস—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৬৭ পৃষ্ঠা।

+ "Early History of the Deccan"—Bhandarkar P. 79

## চতুর্থ অধ্যায়

### সেকালের শাসন-বিভাগ ও সমাজ-ব্যবস্থা

হিন্দু আমলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত বরাবরই একতা অঙ্গানী সম্বন্ধ ছিল। কেহ কাহাকেও অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারিত না, আবার কেহ কাহারও উপর কর্তৃত্ব করিতেও পারিত না। রাজধানীতে রাজার স্থায়ী বাস হইলেও, গ্রামগুলি তাঁহার সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান হইতে বঞ্চিত থাকিত না। প্রত্যেক গ্রামখানির সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিল। নগরের সহিত গ্রামের নিত্য আদান-প্রদান চলিত। একমাত্র রাজ-কর্মচারী, সৈন্ত-সামন্ত ও বড় বড় ব্যবসাদার ছাড়া তখন নগরে আর কেহ স্থায়ীভাবে বসবাস করিত না। চাকুরীর লোভ ও বিলাসিতার মোহ তখন গ্রাম হইতে এমন দলে দলে লোক টানিয়া আনিত না।

প্রত্যেক গ্রামখানি ছিল যেন এক একটি ছোটখাট রাজ্য। প্রত্যেক গ্রামের সীমা নির্ধারিত থাকিত এবং গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির জমির একটা চিহ্নিতনামা ও তালিকা থাকিত। কৃষক শ্রেণী ছাড়া প্রত্যেক বড় বড় গ্রাম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইবার জন্য আরও কতকগুলি শ্রেণীকে আপন বক্ষে স্থান দিত। এই শ্রেণীগুলি প্রথমতঃ পেশাগত ও পরিবর্তনীয় ছিল; পরে জাতিগত হইয়া যায়।

উক্ত মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের গ্রাম্য মাতব্বরের নাম 'পাটেল'; মুসলমান আমলে ইঁহাদের নাম হয় 'মোকদ্দম'। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে ইহাদিগকে 'গ্রামাধিকারী' বলা হইত। ইঁহারা গ্রাম্য সমাজের কর্তা ও শাসন-বিচারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সাধারণতঃ পঞ্চায়েৎ প্রথায় হইত। এই পঞ্চায়েতে অনেক সময় পাটেলই সভাপতিত্ব করিতেন। কিন্তু গুরুতর কৌজদারী অপরাধে পাটেলগণ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার উচ্চতম কর্তৃপক্ষীয় নিকট অপরাধীকে পাঠাইয়া দিতেন। 'চৌগুলা' ও 'কুলক্রানি' সর্ববিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। পাটেলরা প্রায়শঃ শূদ্র অথবা কত্রিয় জাতির মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইতেন। কঙ্কন প্রদেশের বহুস্থলে 'খোট্' নামক আদিম কৃষিজীবীদের মধ্য হইতেই সর্দার বা পাটেল নির্বাচিত হইত।

'কুলক্রানি' ছিলেন যেন গ্রাম্য রাজার গ্রাম্য মন্ত্রী। গ্রামের লোকসংখ্যা, জন্মমৃত্যু, জমিজমার হিসাব-পত্র রাখা, গ্রাম্য-শাসনে পাটেলকে পরামর্শ দেওয়া ছিল ইঁহাদের প্রধান কাজ। ইঁহারা খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন এবং প্রতি কিস্তির খাজনা আদায় লইয়া, পাটেলের মাধ্যমে রাজ-তহবিলে নিয়মিত পাঠাইয়া দিতেন। কুলক্রানিদিগকে কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত 'গ্রাম্যলেখক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণই সাধারণতঃ এই পদে বসিতেন।

সাধারণতঃ ফসলের এক ঘটায়শ রাজকর স্বরূপ আদায় করা

হইত। সময় বিশেষে ও বিশেষ বিশেষ রাজার অস্তিত্ব হিন্দু এক চতুর্থ বা এক পঞ্চমাংশও আদায় হইত। ফসল বা কসালের দ্বারা দাম পাটেল-সরকারে জমা দেওয়া চলিত। খাজনা ছাড়া বিক্রয় পণ্যের উপর অথবা বিদেশী পর্যটকের উপরও এক-প্রকার শুল্ক ধরা হইত।

‘চৌগুলা’ ছিলেন ‘বাড় কালোতে’ ও ‘বাড় আলোতে’ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ও সর্দার। এই সম্প্রদায় দুইটির ভিতরকার শৃঙ্খলা ও নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা ও তাহাদের অভাব-অতি-যোগ পাটেলের সোচরীভূত করা ছিল চৌগুলার প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেক গ্রামের পাটেল, কুলজানি ও চৌগুলা গ্রামের সমস্ত জমির পঁচিশ ভাগের একভাগ নিষ্করভাবে উপভোগ করিতে পাইতেন; তাহাদের পৃথক মাহিনা ছিল না। সাধারণতঃ এই পদগুলি পুরুষাশ্রমিক ছিল।

প্রত্যেক গ্রামের বাড় বালোতের মধ্যে বারোটি শ্রেণী বা জাতির এক একটি পরিবার থাকিত; বাড় আলোতের মধ্যেও ঠিক ঐরূপ। বাড় বালোতের অন্তর্গত বারোটি জাতির নাম :—(১) সূত্রধর বা ছুতার। (২) কর্মকার। (৩) মুটা ও চর্মকার। (৪) ‘মাহর’ বা ‘ধেবু’—গ্রাম্য চৌকিদার ও চর; ইহারা বেশ বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিল। (৫) ‘মাজু’—ইহারা মাহরদের তাঁবে কার্য্য করিত; কেহ কেহ চাবুক, লাগাম প্রভৃতি চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত করিত; সহুপায়ে জীবিকার্জননের সুবিধা না থাকিলে চুরী ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডার কার্য্য করিত। ইহারা বোধ হয় পরবর্তী



কালে ঘেসেড়া, মেথর ও ধান্ধের কার্য করিত। (৬) কুস্তকার। (৭) নাপিত। (৮) ধোপা। (৯) 'গুরো'—ইহারা লোকের গহনাপত্র পরিষ্কার করিয়া দিত, দেব-মন্দিরের বাসনপত্র মাজিত ও পূজার সময়ে ঢাক ঢোল বাজাইত। যুদ্ধকালে ইহারা কাড়ানাকাড়া যাজ্ঞাইবার জগুও নিযুক্ত হইত। (১০) 'ঘোশী'—গ্রামা জ্যোতিষী; ইহারা পূজা পার্বণের দিন নির্ধারণ করিয়া ও জাতকের কোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বংশসম্বৃত্ত হইতেন। (১১) 'ভাট্' অর্থাৎ গ্রামা চারণ; গ্রামের কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ইহারা গান বাঁধিতেন। (১২) 'কাটিঙ্'—ইহারা দেব-মন্দিরের বলি কাটিত, নচেৎ বাজারে মাংস বিক্রয় করিত। আজকালকার কশাই শ্রেণীর মত। 'এই সঙ্গে মুসলমান আঘলে 'মোজা' যুক্ত হন।

বাড় আলোড়ের বারোটি জাতির নাম যথাক্রমে :—(১) 'সোনার' অর্থাৎ স্বর্ণকার। (২) জুহম অর্থাৎ লিহায়েৎ নামক উপাসক সম্প্রদায়ের গুরু; (৩) 'শিম্পী' বা দর্জী; (৪) 'কোলী' বা কোল্ জাতীয় জল-বাহক। পরে ইহারা সর্বপ্রকার জিনিষই বহনাবহন করিত। কোলী হইতে সম্ভবতঃ 'কুলী' শব্দের রেওয়াজ্ হইয়াছে। (৫) 'তুরাল্'—বর্তমান গ্রামা দফাদার বিশেষ। ইহারা বিদেশী অতিথিদের সন্মুখনা করিত, তাহাছাড়া খাদ্যা-বাসের সুব্যবস্থা করিয়া দিত এবং বিদেশীদের গতিবিধি সম্বন্ধে প্যাটেলকে নিয়মিত সংবাদ দিত। (৬) মালী। (৭) গোসাই বা পুরোহিত। (৮) গুর্দী বা কশীবাসক; (৯) 'রামুশী'

বা গ্রামবাসী ভীল; ইহারা খাম্বেল জেলার মধ্যে ও মহাস্থানুর উত্তর ভাগে বহু সংখ্যায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। গ্রাম্য চৌকিদার, বা পাহারাওয়ালার কার্যে ইহারা সবিশেষ কার্যকরী হইত। (১০) তেলী; (১১) তাম্বুলী; ও (১২) 'গতুলী' বা বাদ্যকার। ইহারা বিবাহাদি উৎসবে তোলক বাজাইয়া গাহিত ও নাচিত।

পাঁচটি বড় অথবা পঁচিশটি ছোট মৌজা বা গ্রাম লইয়া একটা 'কশ্বা' (আজকালকার থানার মত) সৃষ্ট হইত এবং কতকগুলি কশ্বা লইয়া একটা 'দেশ' গঠিত হইত। এক একটা দেশ আজকালকার পরগণার চেয়ে সচরাচর বড় হইত না। দেশের কর্তার নাম ছিল 'দেশমুগ' অথবা 'দেশাই'—অনেকটা মুসলমান আমলের জমিদারের মত। ইহাদের দেওয়ান বা উজীরের মত ছিলেন 'দেশপাণ্ডা' বা দেশলেখকগণ। প্রায় ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণগণ এই পদ অধিকার করিতেন; সেইজন্য আজকাল এক শ্রেণীর মারাত্মক ব্রাহ্মণদের জাতিগত উপাধি দেশপাণ্ডে।

'দেশমুগগণ' পাটেলদের নিকট নিয়মিত খাজনা আদায় করিয়া রাজ-সরকারে প্রেরণ করিতেন, প্রয়োজন মত তাহাদের কৈফিয়ৎ তলব করিতেন এবং গ্রামের সামলা-মোকদ্দমার আপাল শুনিতেন। তাঁহার অধীনে একদল সৈন্য থাকিত এবং নিম্ন জমি ছাড়া তাঁহার নগদ টাকার বৃত্তিও পাইতেন। তাঁহার একমাত্র রাজার নিকট কৈফিয়ৎভাজন ছিলেন। সময় ও সুযোগমত দেশমুগগণ 'নায়ক' বা 'রান্না' উপাধি গ্রহণ করিয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের খাজনা বন্ধ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

### মুসলমান আমলে যাদব রাজবংশ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চালুকাদের যেমন পতন হইল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যাদববংশীয় রাজাদের উত্থান দেখা গেল। বহুকাল ধরিয়া ইঁহারা রাষ্ট্রকূট ও কল্যাণের চালুকা বংশীয় রাজাদের সামন্ত ছিলেন। পরে চালুকাদের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। বর্তমান নিজাম রাজ্যের উত্তরপশ্চিম কোণে দৌলতাবাদের সম্মুখে ছিল দেবগিরি নামক স্থান, সেইখানে যাদব বংশীয়েরা রাজধানী স্থাপন করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মহারাষ্ট্রীয় রাজাদের অনেকেই আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যদুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। রাষ্ট্রকূটগণও আপনাদিগকে যদুবংশ-জাত বলিতেন; যাদবগণ তো আপনাদের উপাধির মধ্যেই বংশ-পরিচয় গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন।

যাদবরাজ ভিজয় চালুকাদের সাম্রাজ্য একটু একটু করিয়া গ্রাস করিয়া দক্ষিণপথে রীতিমত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ওদিকে বর্তমান মহীশূরের নিকটে ধারসমুদ্রে রাজধানী স্থাপন করিয়া, হয়শালা-বজ্রাল নামধারী বীরগণ ক্রমশঃ কুক্ষা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর তীর পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। ইঁহারাও যাদব বংশের একটি শাখা। প্রথমে ইঁহারা চালুকা ও

রাষ্ট্রকূটসের করত ছিলেন ; পরে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহাদের ভিতর নবচেতনার সঞ্চার হয়—দাক্ষিণাত্যে এক নূতন স্বাধীন রাজ্য-গঠনে ইহারা কাম্যমনোবাক্যে উদ্যোগী হন ।

ইহাতে দেব-গিরির যাদবরাজের স্বার্থে-আদাত লাগিল । রাজা তিজয় প্রকাশ এক সৈন্যবাহিনী লইয়া হয়শালা-রাজ দ্বিতীয় বীর বজ্রালকে আক্রমণ করিলেন । কিন্তু ভগবান হয়শালাদের সহায় ; প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও যাদবরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না—তিনি রণক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে লইয়া চিরনিশ্চয় শয়ন করিলেন । হয়শালা-রাজ আপনাকে স্বাধীন সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন । হয়শালাদের দ্বিতীয় সম্রাট্ বিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্য-সীমার মধ্যে দ্বৈতাত্বৈতবাদী বৈষ্ণব মহাত্মা রামানুজ আবির্ভূত হন । বিষ্ণুবর্দ্ধন তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিয়া, রামানুজের ধর্মমত প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেনঃ

যাদবগণ কিছুকাল চূপ করিয়া রহিলেন । তারপর ভিন্নমের পৌত্র সিংহন হয়শালাদের উপর প্রতিশোধ লইতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন । এই যদুবংশীয় বীর যুবকের অপূর্ব রণকৌশলের নিকট হয়শালাগণ 'পালা পালা' রব ছাড়িতে লাগিল । সিংহন যুদ্ধ ও জয় করিতে করিতে, হয়শালাদের সমস্ত অধিকার ভেদ করিয়া, একেবারে চোল রাজাদের রাজ্য-সীমা কাবেরী নদীর তীর পর্যন্ত উপস্থিত হইলেন । দাক্ষিণাত্য বিজয় সমাপ্ত করিয়া, সিংহন আধুনিক বেঙ্গালের অধিকাংশ ও মধ্যপ্রদেশের খানিকটা জয়

করিয়া নইলেন। তখন মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া দিল্লীতে রাজতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। তুর্কীস্থানের দাসবংশ তখন উত্তর ভারতের অধিকাংশ দেশগুলি একে একে হস্তগত করিয়া, একটা বেশ ছোটখাটো সাম্রাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। আল্‌তামাশ্ ও সুলতানা রিজিয়ায় সমসময়ে সিংহন দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে একচ্ছত্র সম্রাট্। সিংহন মুসলমানদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেও ছাড়েন নাই।

কিন্তু ভারতে হিন্দু-সাম্রাজ্যগঠনের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে গেলে, বারবার এই সত্যটাই চক্ষে পড়ে যে, স্বদেশীর হাতে সাম্রাজ্য-গঠন কখনও স্থায়ী হয় না, সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় না। জাতিভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, ভাষাভেদ ও সামাজিক আচার ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ইহাদিগকে যেমন এককাল এক অখণ্ড মহাজাতি-(nation) রূপে পরিণত হইতে বাধা দিয়াছে, অত্য়দিকে তেমনি এক দেশীয় রাজার পতাকা তলে স্বাধীনতার নামে সমবেত হইতে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছে। কোন এক রাজা হয়ত আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিরাট প্রতিভার বলে, জীবনব্যাপী সাধনায়, একটা সাম্রাজ্য গঠন করিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্র অথবা অপদার্থ পৌত্র সাম্রাজ্য পরিচালনার কঠোর কর্তব্যে অপারগ হওয়ায়, কিংবা ভারতের চিরন্তন সহজ নীতি—গৃহ-বিবাদের মুকার আঘাতে, তাহা অজিরে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারতে নিমেষে সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে,

আবার নিম্নে ভাগিয়াও পড়িয়াছে। এমনি করিয়া সম্রাটের বংশধরেরা শুধু সাম্রাজ্য-হারা হই নাই, আপন রাজ্যহারাও হইয়াছেন—পরিশেষে দেশের স্বাধীনতাও বিনেশীর পায়ে ডালি দিয়াছেন।

দেবগিরির যাবৎ দিককেও সেই সনাতননীতির রথচক্রতলে পড়িতে হইল। সিংহনের পর তাহার উত্তরাধিকারীদের অক্ষমতার ফলে সাম্রাজ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক এক করিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। চোল ও হয়শালারা পুনরায় বলসক্ক্য করিয়া, নিজদেশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া লইল। চোলদের শ্রুতাপে একদিকে মহানদী ও গঙ্গার জল, অপরদিকে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালা পরস্পর কীটপিতে লাগিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরের কথা। তখন জালালুদ্দিন খালজী দিল্লীর মহারাসনে, রামচন্দ্র রাও যাবৎ দেবগিরির সিংহাসনে। জালালের ভ্রাতৃপুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রী আলাউদ্দিন খালজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। আলাউদ্দিন তখন মধ্যভারতের শাসন-কর্তার পদে অধিষ্ঠিত। তিনি একদিন আট হাজার বাহা বাহা সৈন্য ও প্রচুর রশ্ম লইয়া নর্মদা নদী পার হইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। গোয়ালগড় ও চন্দৌর পর্বতমালা এবং তাণ্ডি, পেনগঙ্গা ও পূর্ণা নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি হঠাৎ আনিয়া দেবগিরি চড়াও করিলেন। রামচন্দ্র রাও একে শান্তিপ্রিয় ও বিনোদসাহী লোক ছিলেন, তাহার উপর বিনামেঘে বহুপাতের ছায়া বিদেশী সৈন্যের এই আচম্বিত আক্রমণে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। সামান্য

একটু যুদ্ধের চেষ্টা করিয়াই তিনি আলাউদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিলেন।

রামচন্দ্র কোথাগোবের সমস্ত ধনরত্ন আলাউদ্দিনের পায়ে ঢালিয়া দিলেন। প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহের সমুদায়ও এই বিজয়ী মুসলমানের ক্ষুধিত চক্ষুর নীচে রাখা কৃত করিয়া দেওয়া হইল। বড় বড় গাড়াতে করিয়া এই সকল নজরানা লইয়া আলাউদ্দিন শহর পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় একটা বিক্রী কাণ্ড ঘটয়া বসিল। রামচন্দ্রের বড় ছেলেটি আলাউদ্দিনের সহিত পিতার শাস্তিজনক কথাবার্তার অবসরে ছুপিসাড়ে নগরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। একে মহারাষ্ট্র রাজার ছেলে, ভায় ধমনীতে যদুবংশের উগ্ররক্ত প্রবাহিত; সে এ অপমান মাথা নীচু করিয়া সহিয়া যাইতে চাহিল না। রাজপুত্র বাহির হইতে তাড়াতাড়ি একদল সৈন্য যোগাড় করিয়া, আলাউদ্দিনকে যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করিল।

নগরের প্রান্তে এক ভীষণ বৃক্ষ হইল। মারাঠী যুবরাজের পরাক্রমে আলাউদ্দিনের বহু সৈন্য হতাহত হইল। কিন্তু বৃক্ষ পিতা বেচারী ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু,—সন্ধির সর্ব্ব তত্ত্ব করিয়া নগর-দুর্গ হইতে পুত্রকে সৈন্য-সাহায্য করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শেষে যুবরাজের পতন হইল। আলাউদ্দিন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, বৃক্ষ রাজার নিকট তাঁহার উদ্ধৃত পুত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। দেব-গিরিরাজ অতি কষ্টে আরো কিছু সোনাধানা সংগ্রহ করিয়া ও বেরারে এলিচপুর



'সামন্ত্র কোম্পানির সমস্ত বন্দুজ  
আলাউদ্দিনের পক্ষে চালিকা দিলেন।'

[ অধ্যায়—৩২ পৃষ্ঠা ]





সম্মিহিত সমস্ত স্থানের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ শাস্ত্র করিলেন।

ইহার পর আলাউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া, দেবগিরির রাজার নিকট হইতে নিয়মিত কর আদায় করিতে লাগিলেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামচন্দ্র গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় পলাতক রাজাকে আশ্রয় দেওয়ায় ও করদানে অস্বীকার করায়, মালিক কাফুরের অধীনে একদল সৈন্য আসিয়া, বহু জয়-পরাজয়ের পরিণামে দৌলতাবাদ অধিকার করিল। শেষে মরণাপন্ন রামচন্দ্র যুদ্ধের খেদারৎ দিয়া ও উচ্চতর হারে করদানে প্রতিশ্রুত হইয়া, মালিক কাফুর ও তাঁহার বাদশাহ প্রভুকে সন্তুষ্ট করিলেন।

কিন্তু দুই বৎসর পরে তাঁহার পুত্র শঙ্কর রাও যাহুব দেবগিরির জগদগুরু সিংহাসনে বসিয়াই দিল্লী-সরকারে মালগুজারি পাঠানো কছ করিয়া দিলেন। আবার মালিক কাফুর সসৈন্যে দেবগিরিতে আসিলেন এবং শঙ্করকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দেবগিরি রাজ্য দিল্লী-সাম্রাজ্যের এলাকাভুক্ত করিলেন। অতঃপর মালিক কাফুর তাঁহার দলবলসহ এখানে বসতি স্থাপন করিয়া, বাদশাহের শাসন করিতে লাগিলেন। ৩১৬ সালের শেষভাগে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে, মালিক কাফুর তাড়াতাড়ি দিল্লী চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে রামচন্দ্রের জামাতা ও শঙ্করের ভগিনীপতি হরপাল দেও কতকগুলি মারাঠা দেশমুখকে দলে টানিয়া আনিয়া, বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। দেবগিরি দুর্গের চারিপার্শ্বের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড

## মহারাজি

হরপালের অধীনে আসিল। কিন্তু আলাউদ্দিনের দুর্জয়িত্র পুত্র সুলতান মুবারিক আসিয়া, বহু সৈন্য-সহায়তায় হরপাল দেওকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। নিষ্ঠুর সম্রাটের আদেশে জীবন্ত অবস্থায় হরপালের দেহ হইতে গাত্রচর্ম টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইল। হিন্দুর স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার উদ্যম আবার কিছু দিনের জন্য অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া রহিল।

বাদবরাজাদের আমলে দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে শিল্প ও সাহিত্যে এক নব জাগরণের সূচনা হয়। বাদবগণ প্রজারঞ্জক, সুশিক্ষিত ও ধার্মিক ছিলেন। দেবগিরির রাজাদের সহায়তায় পণ্ডিত হেমাদ্রি বহুতর স্মৃতিগ্রন্থ সংকলন করেন এবং বোপদেব তাঁহার প্রসিদ্ধ যুগ্মবোধ ব্যাকরণ রচনা করেন। বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বাদবদেরই সামন্ত নিকুন্ডবংশীয় রাজাদের উৎসাহে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার ভুবনবিশ্রুত জ্যোতিষ-বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### বাহ্‌মানী সাম্রাজ্য

১৩২৫ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতা গিয়াসুদ্দিন জোগলকে হত্যা করিয়া, তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ জোগলক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও গোঁড়া মুসলমান ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মত হুদয়হীন ও খাম্‌খেয়ালী বাদশাহ ভারতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় দেখা যায় নাই। হঠাৎ তাঁহার মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিল। তিনি দিল্লী হইতে দেব-গিরিতে রাজধানী পরিবর্তন করিলেন। দেবগিরির নাম তখন পরিবর্তিত হইয়া হইল ‘দৌলতাবাদ’। কিন্তু নানা অসুবিধায় পড়িয়া তাঁহার আবার মতের পরিবর্তন হয়। আবার সকলকে নিজেদের ধন-সম্পত্তি গুরু-বাছুর লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। তখনকার দিনে এই সাত শত মাইল আসা-যাওয়া করিতে প্রজাবৃন্দ ও রাজকর্মচারীদের যে কি নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সে যাহা হউক, মালিক কাবুরের সময় হইতেই তুর্ক ও আফগান দেশীয় মুসলমান-গণ ক্রমশঃ উত্তরপূর্ব মহারാষ্ট্রে ও দৌলতাবাদ অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছিল। তারপর মুসলমান শাসন বন্ধন ঘনিবসের রাজ্যে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বহু

ভাগ্যাবেশী ও ব্যবসাদার মুসলমান এইখানে ভেরাডাণ্ডা বিছাইতে লাগিলেন।

মোহাম্মদ ভোগলকের যথেষ্টাচার ও কুশাসনে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। গুজরাট ইতঃপূর্বেই মুসলমানদের করতলগত হইয়াছিল। সম্রাটের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া, সেধানকার কয়েকজন মুসলমান ওমরাহ ও সামন্ত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; ইহাতে সম্রাট তাহাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ওমরাহ ও সামন্তগণ দৌলতাবাদে পলাইয়া আসিয়া, সেধানকার শাসনকর্ত্তা কতলুগ্ খাঁর আশ্রয় লইলেন। তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কতলুগ্ খাঁর চাকুরী পেল। এই সময় গুজরাট হইতে যে সকল কর্মচারী ও সিপাহী সম্রাটের কার্য্যান্ লইয়া অপরাধীদিগকে ধরিতে আসিয়াছিল, তাহাদের সর্দার নিহত হইলেন।

১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি হিন্দু সামন্তের সহায়তা লাভ করিয়া, এই সকল মুসলমান ওমরাহ বিদ্রোহের খবর উড়াইয়া দিলেন। দৌলতাবাদের দুর্গ বিদ্রোহীদের নিকট তাহার ঘর খুলিয়া দিল। মোহাম্মদ ভোগলক্ ইহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী লইয়া দৌলতাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। সম্রাট দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু বাহির হইতে জাফর খাঁ নামক একজন বিদ্রোহীদের সেনাপতি সম্রাটের দলকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। জয়লাভের উপক্রম

হইতেছে, এমন সময় সত্ৰাট্ খবর পাইলেন যে, দিল্লীতেও একটা বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি আহমদ-উল্-মুন্স নামক সেনাপাশ্বেকর অধীনে একদল সৈন্য রাখিয়া, তাজাতাড়ি রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে বিদ্রোহী জাফর খাঁর দলে ওয়ারাঙ্গলের তৈলঙ্গী রাজার ১৫,০০০ অশ্বারোহী, এবং দৌলতাবাদ দুর্গ হইতে পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্য আনিয়া যোগ দিয়াছে; তাঁহার হাতে পূর্ব হইতেই আরও ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য যোঁজুদ ছিল। সমস্ত বিদ্রোহী দল একত্র হইয়া, জাফর খাঁর অধীনে আহমদ উল্-মুন্সের বাদশাহী সৈন্যদলকে ভীম বিক্রমে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। বিদ্রোহের নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইল। আহমদ-উল্-মুন্স পরাজিত ও নিহত হইলেন। সকল হিন্দু ও মুসলমান্ সামন্ত মিলিয়া জাফর খাঁকে দৌলতাবাদের সিংহাসনে স্বাধীন সত্ৰাট্ রূপে অভিষিক্ত করিলেন।

জাফর খাঁ পূর্বের দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তাঁহার প্রভুকে সেবায় তুষ্ট করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করেন। বিদ্রোহ-কালে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কিছু অর্থ পুরস্কার দেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তিনি নিশ্চয়ই রাজা হইবেন। ব্রাহ্মণের সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ অকরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। জাফর খাঁ, আলাউদ্দিন হাসান্ জল্ বাহ্মানী নাম ধারণ করিয়া, বর্তমান নিজাম রাজ্যের অধিকাংশ ভূভাগ ও পশ্চিম মহারাষ্ট্রদেশের কতকংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত সাম্রাজ্যের

অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে বাহ্মানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল আধুনিক কুলবর্গা বা গুলবর্গার গায়ে; উহার নুতন নামকরণ হইল হাসানাবাদ ( ১৩৪৭ খৃ: )।

ভাগ্যচক্রে এই অদ্ভুত পরিবর্তনে, জাকের খাঁ ওরুফে সম্রাট্ হাসান বাহ্মানী তাঁহার পূর্ববস্ত্রার কথা ভুলিয়া ঘান নাই। কৃতজ্ঞতার মর্যাদা রাখিতে, তিনি তাঁহার পূর্বতন মনিবকে দিল্লী হইতে সসম্মানে ডাকিয়া পাঠাইয়া, তাঁহাকে দেওয়ানের পদ প্রদান করিলেন। উক্তর কালে দেওয়ানের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোন গুরুতর রাজকার্য্য করিতেন না। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হাসান বাহ্মানীর যখন মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার রাজ্য-সীমা উত্তরে প্রাণহিত ও পেনগঙ্গা নদীর তীর পর্য্যন্ত, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর তীর পর্য্যন্ত, পূর্বে ওয়ারাঙ্গল রাজ্যের সীমা ( বর্তমান নিজামরাজ্যের এক তৃতীয়াংশ পূর্বভাগ ) পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে চন্দোর ও মহানদীর মধ্যস্থ ভূভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হাসান বাহ্মানীর পর আরো তেরো পুরুষ ১৫১৮ খৃষ্টাব্দ অবধি বিপুল বাহ্মানী সাম্রাজ্য শাসন করেন। ইতোমধ্যে পেনগঙ্গার উত্তরে বেরার দেশের অধিকাংশও বাহ্মানী রাজ্যের সামিল হইয়াছিল।

বাহ্মানী বংশের পাঠান রাজগণের দেড় শত বৎসরের শাসনকাল-মধ্যে অধিকাংশ মহারাষ্ট্রভূমিই তাঁহাদের তাঁবে ছিল। কিন্তু বহু দেশমুখ ও নায়ক নাম মাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া ছিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ কেন্দ্রীয় শাসন ও সৈন্য-

বিভাগে উচ্চ পদসমূহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অধীন দেশমুখগণ অতি সামান্য মাল্গুজারী প্রাদেশিক মুসলমান শাসন-কর্তাকে পাঠাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন ; তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কচিৎ হস্তক্ষেপ করা হইত। কিন্তু সাতপুরা ও পশ্চিমবাটের দুর্গম স্থানসমূহের ক্ষম্ভার বা দেশমুখগণ এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান অধীনতার কোন ধার ধারেন নাই। আবার সুবিধা ও সুযোগ পাইলে, দেশমুখগণ রাজ্যনা পাঠানো বন্ধ করিয়া ও বিদ্রোহাচরণ করিয়া, কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন।

দ্বিতীয় বাহ্মানী-সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহের রাজত্ব-কালে এইরূপ একটা বিদ্রোহ একটু ঘোরাল রকমের হইয়া উঠিয়াছিল। মোহাম্মদ শাহ্ তুঙ্গভদ্রের দক্ষিণ ভীরে অবস্থিত প্রতাপশালী বিজয়নগর নামক হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে গোবিন্দ দেও নামক ঘানব বংশীয় এক সর্দার— যিনি দেবগিরির পশ্চিমে সামান্য একটু দায়গায় দেশমুখ হইয়া কোন রকমে টিকিয়া ছিলেন, তিনি প্রবল হইয়া, দেবগিরির (দৌলতাবাদের) শাসন-কর্তা, বহরাম খাঁকে হাত করিয়া কেলিলেন। তাঁহারা বাগ্‌লানার রাজার নিকট হইতে অর্থ ও সৈন্য-সাহায্য পাইয়া, অনুপস্থিত সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করিয়া, তাঁহার রাজধানী হাসানাবাদ অধিকার করিতে চলিলেন। এই খবর পাইয়া, মোহাম্মদ শাহ্‌র বিশ্বাসভাজন কর্মচারীরা রাজধানী ও তাহার চতুর্পার্শ্ব হইতে যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইঁহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন।



এমন সময় সম্রাট ও বিজয়নগর সংগ্রাম হইতে রাজধানীতে  
কিরিয়া আসিয়া, সমস্ত ব্যাপার শুনিতে পাইলেন। প্রাচীন  
ভাগ্যারা রাজ্যের রাজধানী পৈবান নগরের নিকট শিউর্গাণ্ডে  
দুইমাসের সৈন্তের সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে, এমন  
সময় একদিন বোড়ার চড়িয়া সম্রাট আসিয়া দুই যুগ্মমান সৈন্তের  
মাঝখানে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বিদ্রোহীদের জয়শা  
মিধিষে উড়িয়া গেল। প্রথমেই বহরাম খাঁ লজ্জায় হেঁট হইয়া  
সম্রাটকে শত কুণীন করিলেন; তাঁহার পিছনে যে যেমিকে  
পারিল পলাইয়া গেল। কিন্তু বহরাম খাঁ একটু ধৈর্য ও সাহসে  
বুক ঝাঁকিলে, তাঁহার দাসমনোভাব এই সঙ্কট সময়ে এমন করিয়া  
তাঁহাকে কানুরুষ না সাজাইলে, হয়ত হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত  
সৈন্য বাহ্যমানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিত।

মাগধালী, কোল প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিরা স্থায়ীভাবে  
তখনও মুসলমানদের শাসনাধিকারে আসে নাই। মহাদেও  
পর্বতভঙ্গলের অধিবাসীরা প্রায়ই মুসলমান অধিকারের মধ্যে  
প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠ-তরাজ করিত। দক্ষিণ কঙ্কনেও  
মহারাত্রিগণ মুসলমানী শাসন কথায় কথায় অগ্রোহ করিতেন।  
পুনা, সাতারা, কোলাপুর, কারড, গুয়াই, জাকখণ্ডি, নাগধানা,  
মাপোলি, বাজাপুর প্রভৃতি স্থান তখনও পর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন  
মহারাষ্ট্রীয় রাজাদের হস্ত-ছায়া-তলে নির্ভয়ে কাল-যাপন করিতে-  
ছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অভিযান প্রেরিত হইত।  
কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই।

অবশেষে ১৪০৬ খৃস্টাব্দে মরিক-উল-জিয়ারের নারকতার  
 একদল সুনির্বাচিত বাহাদুরী সৈন্য এইদিকে প্রেরিত হইল।  
 ছত্বে নানা ক্ষতি স্বীকার করিয়া, মহাদ্রি পর্বতমালার  
 মধ্যভাগের কয়েকটি স্থান তিনি দখল করেন। পুনর চৌদ্দ  
 মাইল উত্তরে চাকুন হইতে জুম্মার নগর পর্য্যন্ত পার্বত্য ভূমিতে  
 মুসলমান পতাকা প্রোথিত হয়। জুম্মারে মরিক জিয়ার এক  
 ভর্তেদা পার্বত্য দুর্গ-নির্মাণ করিলেন এবং চাকুনে একটা  
 শাসন-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তিনি পুনর আরো কয়েক  
 োশ দক্ষিণে ভোরের নিকটবর্তী এক স্বাধীন রাজাকেও  
 অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। যাহা হউক, মহারাষ্ট্র  
 রাজারা পরাক্রমে যদিবা কখনও মুসলমানের নিকট হটিয়া  
 গিয়া থাকেন, কিন্তু কূটকৌশলে তাঁহাদের নিকট কখনও মাথা  
 নীচু করেন নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ভোরের রাজা মল্লিককে বেজিক বানাইবার এক চমৎকার  
 ফলি আঁটিলেন। তিনি জানাইলেন, সিংহগড়ে তাঁহার এক ভীষণ  
 প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঘোর অত্যাচারী রাজা আছেন, তাঁহাকে যদি  
 মুসলমান সেনাপতি জয় করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই  
 তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবেন এবং প্রতি বৎসর নিয়মিত  
 ছড়া হারে খাজনা পাঠাইয়া দিবেন। সেনাপতি সরল  
 প্রাণে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পুনর চারি ক্রোশ দক্ষিণে  
 সিংহগড় দখল করিতে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে একদিন  
 গভীর নিশীথে আচম্বিতে ভোর-রাজের দুর্গের সৈয়দুল দুর্গম

পর্বত-পাখী হইতে পৈশাচিক উজ্জ্বল মুসলমান সৈন্যের উপর আঁপাইয়া পড়িল। সাত হাজার সৈন্য কচুর বক্তো মহারাষ্ট্রের শাপিত খড়্গে কাটা পড়িল। মল্লিক সাহেব কোনরূপে প্রাণ লইয়া ও মানটুকু খোয়াইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর ১৫১৬ বৎসরকাল আর কোন অভিযান এই অঞ্চলে প্রেরিত হয় নাই।

প্রথম বাহমানী সুলতান আলোউদ্দিন হাসানের সময় হইতেই গুলবর্গী সাম্রাজ্য চারিটি প্রদেশে (‘তরফ্’) বিভক্ত হইয়াছিল; এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক একজন শাসন-কর্ত্তী বা তরফদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রদেশগুলির নাম—গুলবর্গী, দৌলতাবাদ, তৈলিঙ্গন ও বেরার। তাহার পর এক শত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তুঙ্গভদ্রা তীরের প্রবল প্রভাপাশ্বিত বিজয়নগর রাজ্যের বেশীর ভাগ, ওয়ারঙ্গল রাজ্য, তৈলিঙ্গন রাজ্যের উত্তরাংশ ও ওড়িষ্যার দক্ষিণ পূর্বাংশ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে কোলাপুর হইতে গোয়া পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহাদের অধিকারে আসিয়া পড়িল। আক্ষকালকার খান্দেশ, নাসিক, থানা, কোলাবা প্রভৃতি তথ্যেকটি জেলা ও চুরারোহ পর্বতাকল ছাড়া সমস্ত মহারাষ্ট্রই তখন মুসলমানদের প্রজা!

ত্রয়োদশ সুলতান মোহম্মদ শাহ্ বাহমানীর উজীর খাজা জাহান্ মাহমুদ গাওয়ারান্ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যকে আর চারিটি প্রদেশে বিভক্ত রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না; কারণ তাহা হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং তাহার

ফলে সুযোগমত ভবিষ্যতে ইঁহার স্বাধীনতা বোকাঘও হস্তান্তর করিবেন না। সুতরাং তিনি স্বাধিকার সমেত পুরাতন চারিটি প্রদেশকে নিম্নলিখিত আটটি তরফে ভাগ করিলেন।

পুরাতন গুলবর্গা প্রদেশ ভাঙ্গিয়া গঠিত হইল—

(১) বিজাপুর—ভীমা ও কৃষ্ণার ত্রিমোহানার পশ্চিম ভাগস্থ সমস্ত দেশ; ইহার সহিত বিজয়নগর-হইতে-বিজিত রাইচুর ও মুলগল শহরও যুক্ত রহিল। উজীর মাহমুদ গওয়ান নিজে এই প্রদেশের শাসন-কর্তা হইলেন।

(২) হাসানাবাদ—ভীমা নদীর উত্তর পারে শোলাপুর, আকালকোট, গুলবর্গা, শাহাবাদ, ওয়াজি প্রভৃতি স্থান ইহার মধ্যে রহিল। হাবশীদেশীয় নসির দীনার ইহার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন।

পুরাতন দৌলতাবাদ তরফ ভাঙ্গিয়া গঠিত হইল—

(৩) দৌলতাবাদ—ইউসুফ, আদিল শাহ ইহার প্রথম শাসন কর্তা।

(৪) জুম্মার—উত্তরে জুম্মার শহর হইতে দক্ষিণে বেলগম পর্য্যন্ত ও গোয়া। ইহার প্রথম শাসনকর্তা হইলেন ফকীর-উল-মুল্ক।

তৈলিঙ্গন তরফ ভাঙ্গিয়া তৈয়ারী হইল—

(৫) রাজমহেন্দ্রী—মসলিপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরপূর্বে প্রায় গঞ্জাম এবং পশ্চিম দিকে প্রায় হাবড়াবাদ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত ভূভাগ। নিজাম-উল-মুল্ক বিহারী ইহার প্রথম গভর্ণার।

(৬) ওয়ারঙ্গল—ইহার প্রথম শাসন-কর্তা হইলেন আজিম খাঁ ।

বেরার প্রদেশ দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া ফক্ট হইল—

(৭) গয়াল—উত্তর ভাগ । ফতেউল্লা ইমদ উল-মুন্স প্রথম শাসক ।

(৮) মাহুর—দক্ষিণ ভাগ । ইহার শাসন-কর্তা হইয়া আসিলেন হাব্বী দেলীর খোদাবন্দ খাঁ ।

রাজমহেন্দ্রী • প্রদেশের শাসনকর্তা নিজাম-উল-মুন্স সুলতানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন । তিনি এক জ্ঞানী কুলক্রানীর ছেলে ; কৈশোরে মুসলমান সিপাহী কর্তৃক বন্দী হইয়া বাহমানী রাজ্যে নীত হইয়াছিলেন । সুলতানের নজরে পড়িয়া তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যায় । মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি ‘হাজারী’ বা এক হাজার সৈন্তের অধ্যক্ষ হইলেন । তারপর মাহমুদ গাওয়ানের বহু খোসাদুদী করিয়া, ক্রমে পাঁচ ও দশ হাজার সৈন্তের সেনাপতিপদে উন্নীত হন । তারপর উজ্জীরেরই সুপারিশে তিনি তৈলিগনের তরফদার হইয়াছিলেন ।

কিন্তু মাহমুদ গাওয়ান তৈলিগন প্রদেশ ভাঙ্গিয়া দুইভাগ করিয়া দেওয়ায়, তাহার প্রতাপ কিছু বর্ষ হইয়া পড়িল । ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, সুলতানের নিকট আসিয়া মিথ্যা করিয়া, তাঁহার বিতৈবী বন্ধু গাওয়ানের নামে রাজদ্রোহের নালিশ রুজু করিলেন । এক প্রকার বিনা বিচারেই এই উপারক্ষয় ও বহুদর্শী উজ্জীরের প্রাণদণ্ড হইল । তখন ধর্ম নিজাম-উল-মুন্স প্রধান মন্ত্রী আসন

অধিকার করিয়া, সুলতানের চোখের উপর বড় বড় জায়গীর নিজের স্তরকে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে নিজামও ঠিক এইভাবে এক কৃত্রিম কর্মচারীর হস্তে নিহত হইলেন। যাহা হউক, নিজাম উজীর লইলে, রাজমহেন্দ্রার শাসন-কর্তার পদে তাঁহার পুত্র মালেক আহমেদ বিহারী উপবেশন করিয়াছিলেন।

সুলতান মোহাম্মদ শাহের স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না ; তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী, দুর্বলচিত্ত ও বিবেচনাহীন ছিলেন। তাঁহার রাজদরবারে বড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা অপবাদ, প্ররোচনা ও বিবাদ-বিসম্বাদের অস্ত ছিল না। গাওরানের মৃত্যুকালীন নীরব অভিশাপ এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপর একদিন কালবৈশাখীর রক্ত কণ্ঠা ডাকিয়া আনিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এতে একে খাজনা পাঠানো বন্ধ ও প্রকারান্তরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মোহাম্মদ শাহর মৃত্যুর সময় তাঁহার রাজ্যসীমা কেবলমাত্র হাসানাবাদের মধ্যে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার পর চারিজন সুলতান অল্পদিন করিয়া রাজতন্ত্বে বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে খেলার পুতুল করিয়া সুচতুর মন্ত্রী কাসেম বারিদ রাজ্য-পরিচালন করিতে থাকিলেন। অবশেষে তিনিও সুযোগে পাইয়া, মন্ত্রীর মুখোন্ খুলিয়া ফেলিয়া, নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এমনই করিয়া দাক্ষিণাত্যের বিরাট বাহমানী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই খণ্ড

রাজ্যগুলির মধ্যেও প্রাধান্য ও রাজনীতি-বুদ্ধি লইয়া কামড়া-কামড়ি চলিল। তারপর বে ঘটনার সূত্রপাত হইল, তাহা পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে সোনার অঙ্করে লিখিত রহিয়াছে।

## সপ্তম অধ্যায়

### আহমেদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা

বাহ্মানী রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী উজীর মাহমুদ গাওয়ান বিজাপুর তরফের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন, তাহা পূর্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। রাজ্যদেশে তাঁহার যখন প্রাণদণ্ড হইল, তখন ইউসুফ আদিল শাহকে দৌলতাবাদ তরফ হইতে বিজাপুরের তরফদার করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিজাপুরে আসিয়া তাঁহার ক্ষমতা-বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ঘটিতে লাগিল। অবশেষে ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া, বিজাপুর রাজ্যে আদিল শাহী রাজবংশের পত্তন করিলেন।

এদিকে দৌলতাবাদের তরফদারের পদ খালি পড়িয়াছিল। তখন কিছুদিন পর্যান্ত নিজাম-উল-মুল্ক প্রায়শঃ রাজধানীতে

বসিয়াই উহার শাসন-পরিচালন করিয়াছিলেন এবং হিঙ্গোয়ী, পাখরী, ভীর প্রভৃতি জিলা দৌলতাবাদের সহিত সংযোগ করিয়া তিনি উহাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তারপর তিনি জুম্মার তরফও দৌলতাবাদের সহিত পুনরায় একীভূত করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা বড় একটা প্রদেশ গড়িয়া তুলিলেন। নিজামের পুত্র মালেক আহমেদ এতদিন রাজমহেন্দ্রীর তরফদারি করিতে ছিলেন। উজীরের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ও অপদার্থ সুলতানকে চোখের আড়াল করিতে ইচ্ছুক না হইয়া, সচতুর নিজাম, পুত্র মালেক আহমেদকে রাজমহেন্দ্রী হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া, দৌলতাবাদের তরফদার করিয়া পাঠাইয়া দিলেন ( ১৪৮৫ খৃঃ )।

নিজাম-উল্ মুক্ নিহত হওয়ার কিছুদিন পরেই মালেক আহমেদ বাকিয়া বসিলেন। পিতার সহায়তায় তিনি তঁহনু প্রভূত ধনবত্ত ও লোভনীয় রাজ্যখণ্ডের সর্ব্বময়্য কর্ত্তা। তিনি ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে আহমেদ নিজাম-উল্ মুক্ বিহারী শাহ—এইরূপ দিগ্গজ নামে ভূষিত হইয়া, ভগ্নপ্রায় বাহমানী সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি দৌলতাবাদ হইতে রাজধানী উঠাইয়া, প্রায় বত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে আহমেদনগর নামক নূতন রাজধানীর পত্তন করিলেন। এইভাবে স্বাধীন আহমেদনগর রাজ্য নিজামশাহী বংশের দ্বারা গঠিত হইয়া উঠিল। এই নবীন রাজ্যকে জয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাহমানী সুলতান কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

নিজাম-উল্-মুকের মৃত্যুর পর, গজাম ও ঢিকাকোল অঞ্চল



রাজমহেন্দ্রী-তরফ হইতে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা কাড়িয়া লইলেন; সুতরাং এই তরফের আয়তন ক্ষুদ্রতর হইয়া যাওয়ায় উহার সহিত ওয়ারঙ্গল্ তরফ মিলাইয়া পুনরায় পূর্বের ম্যায় তেলিঙ্গন তরফ গঠিত হইল। কুতব-উল-মুন্স্ ইহার তরফদার হইলেন। ওয়ারঙ্গল্ ও রাজমহেন্দ্রীতে তরফদারের দুইজন ফৌজদার মোতাবেনু রহিলেন, নূতন রাজধানী হইল বর্তমান হায়দ্রাবাদ শহরের নিকটে গোলকুণ্ডায়। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে কুতব-উল-মুন্স্ স্বাধীন হইয়া গোলকুণ্ডায় কুতব শাহী রাজবংশের ভিত্তিস্থাপন করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে বেরারের ভাঙ্গা তরফ দুইটি পুনরায় জোড়া লাগিয়াছিল এবং কতেউল্ ইম্মদ-উল্-মুন্স্-এর বংশধরগণ ফাঁক পাইয়া, অল্প সকলের মত, এখানেও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইম্মদ শাহীদের স্বাধীনতা বেশাধিন বজায় থাকে নাই। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আব্দুলমদনগরের চতুর্থ নবাব মুর্তাজা নিজাম শাহ্ বহু লড়াই করিয়া, বেরার তরফটি নিজ রাজ্যের সামিল করিয়া লন।

পূর্বেই বলিয়াছি, উজ্জীর আমীর বারিদ নিজেকে হাসানাবাদের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গুল্-বর্গার বাহ্মানী সিংহাসনে কায়ম হইয়াছিলেন। তিনি হাসানাবাদ হইতে কয়েক ক্রোশ উত্তরে বিদর নামক স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদররাজ্য আয়তনে যেমন সকলের চেয়ে ছোট ছিল, ক্ষমতায়ও তেমনি সকলের হীন ছিল। কাজেই বারিদশাহী

রাজ্যও কয়েক বৎসর পরে বেরারের শাহশাহ-ভাগী হইল। ইহার অধিকাংশ বিজাপুর ও বাকী অংশ গোলকুণ্ডা-রাজ্য গ্রাস করিয়া, নিজের দেহ পুষ্ট করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ মহারাষ্ট্রদেশ তুর্কী ও আকগান্ বাদশাহ-কর্তৃক অধিকৃত হইলেও মহারাষ্ট্র দেশমুগল দ্বারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিতেন; কেহ কেহ বা দুর্গম গিরিভূমিতে নিরাপন্ন হইয়া, পরস্পর-বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। মালেক আহমেদ বেহারীর তরফদারের দ্বারা পুনঃ অকালের কতকগুলি সর্দার একযোগে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। মালেক বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়া, নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া, পুনরুচ্চারণার্থে লৌহগড়, সিংহগড় প্রভৃতি দুর্গ-সমেত ভূমি অধিকার করেন। পুনরুচ্চারণপূর্বদিকে খোন্দা-রাজপুরের সর্দারকেও তিনি অবনমিত করিয়াছিলেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডাগামার নেতৃত্বে একদল পর্তুগীজ আসিয়া কেরল দেশের (বর্তমান মাঙ্গালোরের দক্ষিণে) কালিকট নামক স্থানে আসিয়া অবতরণ করেন। কিছুদিন তাঁহারা ভ্রমভাবে দেশবাসীর সহিত মেলাবেশা করার পর, দেশীয় নৌকায় করিয়া নানা নদনদীতে ব্যবসার অধিষ্ঠান বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে আরো কয়েক দল পর্তুগীজ দেশ হইতে আসিয়া পড়িল; তাহারা কেরল ও দক্ষিণ কন্ঠনের স্থানে স্থানে আড্ডা গাড়িল। ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজ হইতে বহু পর্তুগীজ ভারতবর্ষে আসিয়া জুটিল; তাহাদের

সঙ্গে গোপনে কামান-বন্দুকও প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইল। শেষে তাঁহারা আহমেদনগর ও বিজাপুর রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে দারুণ দস্যুতাও শুরু করিল।

গোরা তখন বিজাপুর সুলতানের অধীন। পর্তুগীজদের নাকক আলফোঞ্জো ডি আলবুকার্কেস সতৃষ্ণ দৃষ্টি ইহার উপর পতিত হইল। ইতঃপূর্বে তিনি দাবুল শহর সৃষ্ঠন করিয়া, জয়সাহে করিয়া দিয়াছিলেন। তিম্বোজী নামক কেবল দেশীয় এক দুর্দান্ত জলদস্যু পর্তুগীজদের দলে আসিয়া যোগ দিলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়ার উপর পর্তুগীজ কামানের গোলা আসিয়া হুড়ার বিতীষিকা সৃষ্টি করিল। ভারতবর্ষে এই প্রথম কামান গর্জন শ্রুত হইল। গোয়ার শাসন-কর্তা সদলবলে পলাতনপর হইলেন। গোয়ার চারিপাশে বহুস্থান পর্তুগীজরা শ্রুত দখল করিয়া লইয়া, একটি ছোটখাট স্বরক্ষিত রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। পরে সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই গোয়াকেই কেন্দ্র করিয়া, তাঁহারা সারা পশ্চিমভারতীয় উপকূলে সুবিধামত জলদস্যু-রুষ্টি ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন।

১৫২৯ খৃষ্টাব্দে আহমেদনগরের দ্বিতীয় সুলতান বুর্হান নিজাম শাহ্ এক মহারাষ্ট্রীয় আক্ষকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটনাটি মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা। প্রধান মন্ত্রীর নাম হইলে 'পেশ্‌ওয়া'। তখন হইতে নিজামশাহী শাসন-তন্ত্রে হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়েরা যথেষ্ট প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। এককাল দলীল-দস্তাবেজ, নথী-পত্র ও হিসাবাদি পারস

ভাষায় লিখিত হইত ; ইব্রাহিম আদিল শাহ-এর আমলে সর্বপ্রথম বিজাপুর রাজ্যে এ প্রথা উঠাইয়া নিয়া মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিবার ব্যবস্থা করা হইল ।

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিজাপুর রাজসরকারে ৩ সৈন্যদলে বহু মহারাষ্ট্র যোগ দিতে লাগিল । ইব্রাহিম আদিল শাহ বিদেশী সেনাদল ভাঙিয়া দিলেন এবং তৎপরিবর্তে দেশীয় সৈন্যদল গঠন করিলেন । এই সময়ই “বর্গীর” নামক মহারাষ্ট্র অশ্বসারী সৈন্যদলের সৃষ্টি হইল । পূর্বে ছিল ‘শিলীদার’ অর্থাৎ যে ঘোড়-সওয়ার সেনা নিজের ঘোড়া নিজে যোগাইত । এখন হইতে নিয়ম হইল—রাজসরকার বা জায়গীরদার সৈন্যদের ঘোড়া কিনিয়া দিবেন ; তাহাদের নাম হইল বর্গীর । এইরূপে ৩০,০০০ স্থায়ী বর্গীর সৈন্য বিজাপুরের মাহিনা খাইতে লাগিল । এই মারাঠী ঘোড়সওয়ারগণই পরবর্ত্তিকালে ভারতের সর্বত্র ‘বর্গী’ নামে এত প্রসিদ্ধি লাভ করে ।

বিজাপুর ও আহমেদনগরের অধীনে বহু পরগণায় মহারাষ্ট্রীয় দেশমুখগণ বাহাল ছিলেন । তাহাদের তাঁবে অনেক সময় বড় বড় জায়গীর ও কেল্লা থাকিত । জেলার কর্তাকে ‘মোক্তাদার’ বলা হইত । ইনি জেলার খাজনা হইতে একটা অংশ নিজের পারিশ্রমিক স্বরূপ কাড়িয়া রাখিয়া, অবশিষ্টাংশ সুলতানের কোষাগারে পাঠাইয়া দিতেন । কোন কোন জেলার মোক্তাদার মহারাষ্ট্রীয় আক্ষিপ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন । অন্যে অন্যে হিন্দু-মুসলমানে একটা মৌজাদারের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল ।

প্রথম প্রথম হিন্দুধর্মের উপর কিছু অত্যাচার চলিলেও শেষে ধীরে ধীরে মসজিদের পাশে উত্তম মন্দির মাথা উঁচু করিয়া উঠিল। মুলতানগণ বিদ্বাদী মোকদ্দারগণকে ক্রমে ক্রমে 'রাজা', 'রাও', 'নায়েক' প্রভৃতি উপাধি দিয়া, ভুষ্ট করিতে লাগিলেন।

দেবগিরির যাদব রাজবংশীয়দের এক বংশধর ছিলেন লাখোজী যাদব রাও; ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আহমেদনগরের মুলতানের অধীনে সিন্ধুখয়েরের দেশমুখ ছিলেন। চতুর্দিকে তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তাঁহার আদেশ-প্রতীক্ষায় অনুন দশ হাজার যোড়সওয়ার সৈন্য মোতায়েন থাকিত। দৌলতাবাদের নিকট ভিরোল নামক গ্রামের ভোঁস্লে পরিবার খুব সম্ভ্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন; এই পরিবারের অনেকেই লুণ্ঠাতির সহিত পাটেল্-গিরি করিয়া উপরিওয়ালার শুনজরে পড়িয়াছিলেন। যাদব রাওয়ের পরিবারের সহিত ইহাদের বন্ধুত্ব ছিল।

বৃদ্ধ পাটেল্ বাবাজী ভোঁস্লেদের দুই ছেলে; বড়টির নাম মল্লজী ও ছোটটির নাম বিট্টুজী। মুলতানের দেশমুখ মুগপাল রাও নিম্বল্কারের ভগ্নী দীপাবাসীরের সহিত অল্পবয়সেই মল্লজীর বিবাহ হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে পঁচিশ বৎসর বয়সে, লাখোজী যাদব রাওয়ের সহায়তায়, তিনি নিজাম শাহী সরকারে রাজধানীতে এক অস্বারোহী দলের নায়ক হইলেন। খোঁড়াগুলির মালিক

ছিলেন তিনি নিজেই। বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্ভান-সম্মতি হইল না দেখিয়া, তিনি শরীফ তুলজাপুরের প্রসিদ্ধ ভবানী ঘেরীর মন্দিরে, পূজা মানৎ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও ফল হইল না, তখন তাঁহার শাহ শরীফ নামক এক প্রসিদ্ধ পীরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। পীরের দোয়ায় ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে দীপাবাসী এক বলিষ্ঠ পুত্রসম্ভান প্রসব করিলেন। পীরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে তাঁহার পুত্রের নাম রাখিলেন শাহজী। পরবৎসরে আর একটি পুত্র-সম্ভান জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার নাম রাখা হইল শরীফজী।

মল্লজী ক্রমশঃ রাজধানীর মধ্যে ও বাহিরে বেশ একটু নাম করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতির কথা সুলতান মুর্তাযা নিজাম শাহরও কাণে উঠিয়াছিল। পদ-মর্যাদায় কিছু ছোট হইলেও মল্লজীর সহিত ঘাসব রাওয়ের বন্ধুত্ব বেশ পাকিয়া উঠিল। শাহজী তখন পাঁচ বৎসরের সুন্দর, সুপুষ্ট ও সচঞ্চল শিশু। হেলির নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে, মল্লজী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া পঞ্চম দোলের দিন ঘাসব রাওয়ের বাগান-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মান-বাজনা আমোদ-আহ্লাসে আসর সরগরম, কাণ্ডহার গুঁড়ায় সকলের দেহ লালে লাল।

শাহজীকে দেখিয়া ঘাসব রাওয়ের বড় পছন্দ হইল; তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আদর করিয়া মুখুশন করিলেন। পাশেই তাঁহার তিন বৎসরের কন্যা জীজীবাসী বসিয়াছিল। ঠাট্টাচ্ছলে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁ না, এই ছেলেটিকে

দিয়ে করবি?’ জীজী তাহার কৌতূহলপূর্ণ আন্তর চক্ষু শাহজীর দিকে ফিরাইয়া, অকপট সম্মুখিত ঈর্ষা মাখা বাড়িল। কিছুক্ষণ পরেই শাহজী ও জীজীতে ভাব জমিয়া উঠিল। দুইজনে দুইজনের গায়ে মাখায় রঙ মাখাইয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। এই সময় মল্লজী ভৌস্লে সেই আনন্দ-মজলিসের মধ্যে উঠিয়া ঠাড়াইয়া বলিলেন, “ভাইসব, আপনারা শুশুন—আজ এই শুভদিনে আমার ছেলে শাহজীর সঙ্গে জীজীবাস্ত্রয়ের বিবাহ একপ্রকার পাকা হেয়ে’ গেল।” সকলে “বেশ ত, বেশ ত” বলিয়া কলধ্বনি করিয়া উঠিলেন। যাদব রাও উহা ভৌস্লের বঙ্গ ভাবিয়া মুহু মুহু হাসিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে যাদব রাও একদিন মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু মল্লজী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার পুত্রের সহিত জীজীর বিবাহ-সম্বন্ধ সত্যই পাকা হইল কিনা—তাহা জানিতে না পারিলে, তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যাদব রাও দোলোৎসবের একটা অসার বিক্রপকে এতবড় একটা মহাশয্যে পরিণত করিতে চাহিলেন না। তাঁহার গর্বিতা স্ত্রী, স্বামীর এই রহস্যকে পর্য্যাপ্ত তীব্র ভাষায় নিন্দা করিলেন এবং পদমৰ্ত্ত্যারা ও অর্থবলে হীন ওই ভৌস্লে পরিবারে মেয়ে দেওয়ার কল্পনা করিতেও লজ্জিতা হইলেন।

কথিত আছে, এই প্রত্যাখ্যানে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, মল্লজী তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া কিছুদিনের জন্য শ্রগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে স্বামিস্ত্রীতে দিব্যরাত্র কুলদেবী মা

তবানীর পূজায় অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদিগকে এক গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান বলিয়া দিলেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে ও তাঁহার বংশে এক স্বাধীন ও শঙ্করসদৃশ গুণবান নৃপতির উদ্ভব হইবে—এই আশীর্বাদ করিয়া দেবী অদৃশ্য হইলেন।

এই গুপ্ত ভাণ্ডারের অর্থে মরজী বহুতর অর্থ কিনিয়া বাছা বাছা বোচ্চা যোগাড় করিলেন এবং তাহাদিগকে স্থলতানের সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। তাহা ছাড়া, গ্রামের চারিপাশে বহুতর কূপ, পুকুরিগী খনন করিয়া এবং বহুতর মন্দির ও মসজিদে ইনাম দিয়া, তিনি হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তারপর স্থলতান তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মনসব্দার ও পুণা এবং সোপা পরগণার বিস্তৃত জায়গীর দান করিয়া, শিউনারী ও চাকুন্ দুর্গের অধীশ্বর করিয়া দিলেন। তাঁহার 'রাজা' উপাধিও স্থলতান অমুমোদন করিলেন। বাদব রাও ও তাঁহার পত্নী দেখিলেন যে, তাঁহাদের কন্যা এখন ভৌসুলের ঘরে দিলে মান বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। সুতরাং ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে বালক শাহজীর সহিত জীর্জীবাস্ত্রয়ের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। বিবাহ-সভায় স্থলতান স্বয়ং গুহরাহগণকে লইয়া উপস্থিত ছিলেন।



## অষ্টম অধ্যায়

### মুঘলবৃগ্গে মহারাষ্ট্র

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লী সাম্রাজ্যে পাঠান শাসন লুপ্ত হইয়া যায়। মুঘল জাতীয় বাবর দিল্লীর সম্রাট হইয়া গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুস্থান শাসন করেন। পরবর্তী মুঘল সম্রাট্ হুমায়ুন বা আফগান সম্রাট্ শের শাহ্ কখনও নর্মদার দক্ষিণে তাঁহাদের লুক্কৃষ্টি প্রেরণ করেন নাই। তারপর আকবর সম্রাট্ হইয়া, রাজপুতানা, গুজরাট্ ও বাঙ্গালা দেশে মুঘলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিজ্ঞাগিরির দক্ষিণে তাঁহার বিজয়-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। প্রথমেই তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইল ঝাঞ্জেস। ঝাঞ্জেসের কেন্দ্র ভাগ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই এক আফগান রাজার করলে পড়িয়াছিল ; তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখানে নিশ্চিন্ত সুখে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঝাঞ্জেসের সামান্ত অংশ আহ্মেদনগরের অধভুক্ত ছিল। আকবর সমস্ত ঝাঞ্জেসটাই অধিকার করিয়া লইলেন। তাহেই আহ্মেদনগর রাজ্যের সহিত মুঘলদের গোলমাল পাকাইয়া উঠিল।...

রাজ্যসীমানা বৃদ্ধি লইয়া আহ্মেদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যত্রয়ের মধ্যে প্রায়ই কগড়া-কাঁটি, মারামারি, কাটাকাটি চলিত। ইহাতে এক এক সময় এক এক পক্ষ অত্যন্ত দুর্বল

হইয়া পড়িতেন। তদুপরি রাজসভায় ওম্বাহদের পরাম্পরের মধ্যে ঈর্ষান্বেষ ও হানাদির অকার ছিল না। সুলতানসম্রাট ইচ্ছাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কিছু করিতে পারিতেন না। আহমেদনগর রাজ্যে এই সময় দুইটি দল প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় যোঁরতর অঙ্কুরশ্বে ব্যাপ্ত। রাজু নামক এক হিন্দু মস্তুর একটা বিরাট দল ছিল। আবার সুলতানের হাবলী জাতীয়া বেগমের বাপ-ভাইদের একটা দল পাকাইয়া উঠিয়াছিল। মালিক আশ্বর নামক একজন অমাত্য ইহার দলপতি হইয়াছিলেন।

আহমেদনগর ও বিজাপুরের ঝগড়া-বিবাদ যদি মিটিয়া যায়—এই আশায় সুলতান হুসেন নিজাম শাহ, বিজাপুর-রাজ আলি আদিল শাহর সহিত তাঁহার কন্যা চাঁদবিবির বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের বৌতুকস্বরূপ শোলাপুরের দুর্গ তিনি জমাতাকে দান করেন (১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে)। বিজাপুর-সুলতান বিনা আপত্তিতে এই বিবাহে যে অশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহারও একটা গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কুকা ও তুঘলভার নদীর দক্ষিণ ভাগ হইতে ভারতের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিরাট ভূভাগে কানারী ভাষাভাষী দ্রাবিড় হিন্দুগণ বিজয়নগর রাজ্যের প্রভিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাহমানী রাজ্যের মুসলমান সম্রাটগণ ইহাধিস্থের কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই; বরং ইহারাই তাহাদের রাজ্য-সিঁতারে ক্ষেদ্র শতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিক্রমে বাধা দিয়াছিল। ইহাদের ক্ষমতা রাজা কুকারায় ও সদাশিব রাওর সময় এক

বাড়িয়া উঠে যে, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্থান বিশেষ অধিকার বা লুণ্ঠন করিতে ইহারা ইতস্ততঃ করিত না। আবার বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহমেদনগরের মধ্যে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত, তখন ইহারা চুর্বিলপক্ষে সৈন্ত-সাহায্য করিত।

বিজয়নগর রাজ্যকে পরে কণাটি রাজ্য বলা হইত; এইরাজ্য ইরাজেরা কৃষ্ণার দক্ষিণস্থিত মহীশূরের কর্ণ রাজ্য বাতীত সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে কর্ণাটিক বলিয়া থাকেন। বাহা ইউক, বিজয়নগর ক্রমে ক্রমে যখন উত্তরস্থ সকল মুসলমান সুলতানের শত্রু হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা প্রত্যেকেই এককালে নিজের মনে পোষণ করিতে লাগিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার ভয় ছিল সবচেয়ে বেশী, কারণ বিজয়নগরের নিকট ক্ষতি হইতেছিল সবচেয়ে তাহাদেরই বেশী; সুতরাং এই দুই রাজ্য বিজয়নগরকে জয় করিতে জোট পাকাইল। বিদর রাজ্য তখনও কয়টি জেলা আঁকড়াইয়া ও বিজাপুরকে মুকাবে করিয়া, কোনমতে টিকিয়া ছিল। সে-ও বাহা হইয়া ইহাদের সহিত যোগ দিল। তারপর আহমেদনগরও আসিয়া যোগ দিল। চারি রাজ্যের মিলিত প্রায় আশী হাজার বাহা সৈন্ত বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্ভা বেগে ছুটিয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে অনেক মহারাজীয় সৈন্ত ও সেনানায়ক ছিলেন। তালিকোট ও মুঙ্গলের মধ্যস্থলে কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়নগরের সহিত কয়মাস কালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ চলিল (১৫৬৫ সাল)। ইহার ফলে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হইয়া

গেল। হিন্দুর প্রাসাদ-মন্দির-শোভিত অপূর্ব শোভাসম্পন্নালী রাজধানী শ্মশানে পরিণত হইল।

ইহার পর আহমেদনগর রাজ্যে পূর্ব হইতে যে ঘরোয়া বিবাদ চলিতেছিল, তাহা পুনরায় পূর্ণোন্মেষে ফুটু হইয়া গেল। এদিকে বিজাপুর-রাজ আলি আদিল শাহ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে নিহত হইলে, তাঁহার বিধবা মহিষী চাঁদবিবি শিশুপুত্র ইব্রাহিমের অভিভাবিকা স্বরূপ রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রীলোকের অধীনতা কেহই স্বীকার করিতে চাহিল না; দরবারে দলাদলির ঘোঁট ভীষণভাবে পাকাইয়া উঠিল। দেশীয় মুসলমান এবং বিদেশী—বিশেষতঃ পারস্য ও হাবশী মুসলমানদের ভিতর বহুকাল ছইতেই যে রেবারেখা চলিতেছিল, তাহা ইব্রাহিমের নাবালকত্বের সুযোগে দাবাখির মত ঘলিয়া উঠিল। চাঁদবিবি যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, তেমনি আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। তিনি বিচক্ষণতার সহিত এই সকল দলাদলি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম নাবালক হইলেন, চাঁদবিবি পিত্রালয় আহমেদনগরে চলিয়া গেলেন।

আহমেদনগরেও দলাদলির অভাব ছিল না, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। হিন্দুমন্দির ধ্বংস ক্রমশঃ দেশীয় মুসলমানগণ (অর্থাৎ যে সকল হিন্দু ছই চারি পুরুষের মধ্যে মুসলমানধর্মো নীক্ষিত হইয়াছে) আলিয়া দলপুষ্ট করিল। ওদিকে হাবশী দলের হাতে সুলতানগণ উঠিতে-বসিতে লাগিলেন। ছই চারিজন মহারাষ্ট্র

সর্দার বঁহিয়া বলিলেন । অত্যাচার, অবিচারের প্রোক্ত রম্যর বেগে  
রাজ্যের সর্বত্র বঁহিয়া চলিল । তখন দুই চারিজন হিন্দু-মুসলমান  
সম্রাট ব্যক্তি ঘোষণা মূল-সম্রাট আকবরের সৈন্য-বাহিনীকে  
রাজ্যের এই অরাজকতা বিদূরণে মহারাজা করিতে ডাকিলেন ।  
তখন খান্দের-জয় শেষ করিয়া, আহমেদনগর-সরকারের কোন  
কার্য্যকরী প্রতিবাদ করিবার সময় না দিয়াই, মূল সৈন্যগণ  
বিস্ময়বেগে আহমেদনগর রাজধানীর উপর আঘাত পড়িল ।

পিতৃভূমি অক্ষয়করভলগত হয় দেখিয়া কিংবা চাঁদ সুলতান  
সমস্ত হিন্দু-মুসলমান লোককে একত্র করিয়া, তাহাদিগকে প্রাণপণে  
বুঝ করিবার এক প্রাণোচ্ছাদিনী প্রেরণার উদ্দেশ্য করিয়া দিলেন ।  
বিক্রমেই তিনি হুগের প্রাকারে দাঁড়াইয়া সেনাপতিগণকে  
সৈন্য-পক্ষিালনে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । রাজধানীর সমস্ত  
সৈন্য এক জোটে সমর-সমুদ্রে ঝুপাইয়া পড়িল । শত চেষ্টায়ও  
আকবরের সৈন্যদল আহমেদনগর দখল করিতে পারিল না,  
তাহারা পরাজয়ের লাল্হরা মাথায় সহিয়া ফিরিয়া আসিল ।  
কিছুদিনের জন্য আহমেদনগরের পাঠান-স্বাধীনতা, চাঁদের  
তেজোবীপ্তিতে, রক্ষিত হইল ।

কিন্তু অকৃতজ্ঞ হাবশী ওমরাহগণ বিজাপুর-কুল-বধু চাঁদের  
এ প্রভাব-গৌরব বরদাস্ত করিতে পারিল না । দুগু চক্রান্তে  
পড়িয়া চাঁদ আঁচরে ক্ষুণ্ণ হাতকের হাতে প্রাণ দিলেন । রাজ্যের  
প্রাণ গেল, দেহ পড়িয়া রহিল । প্রতীক্ষমান মুঘল শত্রুণী তাহার  
উপর উড়িয়া আঘাত বসিল । হাবশী দলের সর্দার মালিক অম্বর



নিজেই তিনি দুর্গের আঁচীরে দাঁড়াইয়া সেনাপতিগণকে সৈন্য-পরিচালনে  
উৎসাহ দিতে লাগিলেন ।

[ মহাভারত—৬০ পৃষ্ঠা ]



খুব প্রতাপশালা হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যোগের অন্ত রাখিলেন না। কিন্তু চাঁদীর সঙ্গে সঙ্গে পাঠানের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। আহমেদনগর রাজধানী মুঘলের করায়ত্ত হইল। নিজাম-শাহী বালক হুলতামকে বন্দী করিয়া, গোরালিঘর দুর্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

রাজধানী গেল, কিন্তু রাজ্য গেল না। মালিক অম্বর উখন বলবল সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া পুরাতন রাজধানী দৌলতাবাদের নিকটে ক্ষীরকী গ্রামে আসিয়া আশ্রয় গাভিলেন। পরবর্তী কালে এই ক্ষীরকীর মাঝে আওরাঙ্গজাব হইল। ক্ষীরকীতে তাড়াগাড়া কয়েকখানা ছোটবড় জট্টালিকা গড়িয়া তোলা হইল। এখানে মালেক অম্বর, প্রধান মন্ত্রিরূপে দ্বিতীয় মুর্তাজা নিজাম শাহকে সিংহাসনে বসাইয়া, দুর্গের উপর বেহারী বংশের স্বাধীনতা-নিশান উড়াইয়া দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যের সম্মান ও প্রতিপত্তি ফিরিয়া আসিল। তারপর বিশ বৎসর কাল মুঘলগণ আহমেদনগরের নুতনতম রাজধানী দখল করিবার প্রভূত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

মালেক অম্বর গোঁড়াগুড়ি হইতেই মহারাষ্ট্রীয় অমাত্য ও সৈন্যদাণ্ডবিশেষের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু ইর্বাণের সহযোগিতা অভাবে রাজ্য চলে না দেখিয়া, তিনি যনের কাল যনেই রাখিয়া দিলেন। নুতন রাজধানী পত্তন করিবার পর যৎ



মহারাজ্ঞগণকে ধুনি রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে নূতন নূতন সুবিধা ছাড়িয়া দিতে হইল। মালেক রাজস্ব-বিভাগে বহু নূতন প্রকার প্রবর্তন করিলেন। তাঁহার শাসন-কালে রাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। ভূতপূর্ব নিজামশাহী সরকারে লাখোজী যাদব রাওয়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু নানা কারণে এই প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিতে গিয়া, বহু মালেক অধর তাঁহার সহিত বগড়া বাধাইয়া বসিলেন। তখন যাদব রাও ১৬২১ খৃষ্টাব্দে সামুচর মুঘলদের দলে গিয়া যোগ দিলেন। মুঘলগণ তাঁহাকে সমস্রানে গ্রহণ করিলেন এবং নূতন নূতন জায়গীর সমেত চকিশ হাজারী মনসবদারের পদ দান করিলেন।

কিন্তু তাঁহার বেহাই মল্লজী ভৌসুলে মালেক অধরের দলে ভুতু পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বৃত্তার পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজী ভৌসুলে পিতার চাকুরীতে বহাল হইয়াছিলেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে শাহজী যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শাহজীর মামা মুসপাল নিহত হন। যাদব রাও আহমেদনগর রাজ্যের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করার মালেক অধর নিজেকে বেশ একটু অসহায় মনে করিলেন। তাহার পর হইতে তিনি মহারাজ্ঞ নায়ক ও দেশমুখদের যথেষ্ট খাতির করিতে লাগিলেন। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলদের সহিত একটা বড় রকমের যুদ্ধ-আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার কালে মালিক অধরের ভুতু হয়।

এইবার দুই চারি কথায় বিজাপুরের কথা একটু বলিয়া

লই। চাঁদবিবির পুত্র ইব্রাহিম প্রথম বয়সে এফটু বিলাসী ও বিষয়-কর্মে উদাসীন ছিলেন। তারপর মুঘলেরা যখন প্রতিবেশী আহমেদনগরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি বজ্রকঠোর হস্তে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন; দুই মন্ত্রীদিগকে একে একে তাড়াইয়া দিলেন এবং রাজ্যের মধ্যে চমৎকার শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। ওদিকে আহমেদনগর রাজধানী ও তাহার চারিপার্শ্বের কয়েকটি জেলা দখল করিয়া লইয়া, মুঘল সেনাপতিদের নজর দিয়া পড়িল কিম্বাপুরের স্বর্ণ-সিংহাসনের উপর। ব্যাপার আগে হইতেই অনুমান করিয়া, ইব্রাহিম আদিল শাহ মুঘলদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সন্ধি উভয়পক্ষেই অগ্রবিন্তর সম্মানজনক সর্ত্তে স্থাপিত হইল।

সন্ধি করার আরও একটা কারণ ছিল। আহমেদনগর রাজ্য বরাবরই তাহার পৈত্রিক রাজ্যের সহিত কলহ করিয়া আসিতেছে; এমন কি, তাহার পিতা আলি আদিল শাহ শোলাপুরের যে দুর্গ বিবাহের মৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন, তাহাও মালেক অম্বর গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন। মুঘলরা ইব্রাহিমকে শুধু শোলাপুরের দুর্গ নহে, তাহার পূর্বের বিদররাজ্য-সীমান্ত পর্যন্ত আরও পাঁচ ছয়টি দুর্গ জয় করিয়া দিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এইবার আবার আহমেদনগর রাজ্যে ফিরিয়া আসা যাক। দ্বিতীয় মুর্জায়া নিজাম শাহ সেই কিশোর বয়সে হুলস্থলান হওয়া

অবধি এতদিন মালেক্ অশ্বরের খেলার পুতুল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জুলজন্ একটু হাঁক্ ছাড়িবে—মনে করিতেছেন, এমন সময় মালেক্ অশ্বরের পুত্র ফতে খাঁ প্রধান উজীরের পলে কারেম হইয়া বসিলেন। কথায় বলে—বীশের চেয়ে কফি দড়, ফতে খাঁও হইলেন সেই রকম। তাঁহার অভ্যাসে অতিষ্ঠ হইয়া মৃত্যাজা তাহাকে কান্নাকান্ন করিয়া বিচিষ্ট হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে মুঘল অধিকারের শাসন-কর্তা ছিলেন খাঁ জাহান সোদী। ইনি জাতিতে আফগান ছিলেন শু দিল্লীর সম্রাটকে নিয়মমত খাজনা পাঠাইতেন না বলিয়া সম্রাট শাহজাহান তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাকে মালবে কলী হইবার হুকুম দিয়া, সম্রাট্ খাঁ জাহানকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খাঁ জাহান মালব পর্য্যন্ত গিয়া বুদ্ধিতে পারিলেন যে, সম্রাট্ তাঁহাকে শাস্তি দিতেই নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। কাজেই তিনি পাছু কিরিয়া দাক্ষিণাত্যে নিজামশাহী রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে পাকড়াও করিবার জন্য তিনজন পাকা সেনাপতির অধীনে তিন হাল সৈন্য লইয়া, শাহজাহান নিজে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ( ১৬২৯ খৃঃ অব্দ )।

তিন দিক হইতে সর্ব্বদা গতিতে অসংখ্য মোগল বাহিনী আহ্মেদনগর রাজ্যের নূতন রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া মৃত্যাজা নিজাম শাহ তাঁহার হিন্দু-মুসলমান সেনাপতিদের মুঘল আক্রমণের পাণ্টা জবাব দিতে বুঝকের

পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যাহার জন্য যুদ্ধ—সেই থা জাহান বিজাপুর রাজ্যের দিকে পলাইয়া গেলেন। তখন আহমেদনগরীয় সেনাপতিগণ মনে করিলেন—এইবার বোধ হয় মুঘলেরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া বিজাপুরের দিকে দৌড়িবে। কিন্তু মুঘলের শাসিত তরবারী তাহাদেরই মস্তকোপরি উদ্ভাট হইয়া দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেকে যুদ্ধ-অয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল। শাহজী ভেঁস্লে বেসতিক দেখিয়া তখনকার মত উপযাচক হইয়া মুঘলের বশ্ততা স্বীকার করিলেন। মুঘল সেনাপতি আজিম খাঁ, সন্ধ্যাতের হইয়া, তাহাকে ছয় হাজারী মনসব্দের করিয়া দিলেন এবং তাহার পুরাতন জায়গীর ছাড়া আহমেদনগর সম্বিহিত আরও কয়েকটি জেলায় তাহার মুকুন্দদারী স্বীকার করিলেন।

বিজাপুর রাজ্য মুঘলের মিত্র ; সুতরাং আশ্রয়প্রার্থী থা জাহান লোদীর অনুনয়-বিনয়ে কোন ফল হইল না। সেখান হইতে তিনি পুনরায় ক্ষীণকীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এবার যুদ্ধ বেশ ঘোরতর রকমের বাধিয়া উঠিল। আজিম থা বহু সৈন্যক্ষয় করিয়া, অবশেষে ক্ষীণকী নথল করিলেন। তারপর মুঘল সেনাপতি জেলার পর জেলা, দুর্গের পর দুর্গ জয় করিতে করিতে একেবারে ক্ষীণকীর দক্ষিণ-পশ্চিম-স্থিত খারুরের দুর্গজয় কোলা পর্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিলেন। মুঠাজা নিজাম শাহ্ এই বোর বিপদে জ্ঞানভ্রান্ত হইয়া, ক্ষতখাঁকে কারামুক্ত করিয়া, সকাতে তাহার সহযোগিতা-ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু সাহায্য

করা দূরে থাকুক, দুবিমীত ফতে খাঁ প্রভুকে কারাগারে পুরিয়া, কানী-কাঠে ঢড়াইয়া দিলেন।

বিজাপুরের সহিত মুঘলের আপোষ-সাক্ষর একটা সন্ধি ছিল এই যে, তাঁহার। শোলাপুর হইতে থাকুর পর্যন্ত পাঁচ-ছয়টি দুর্গ তাঁহার অধুকূলে জয় করিয়া দিবেন। ইব্রাহিম আদিল শাহ তখন পরলোকে। তাঁহার যুবক পুত্র তখন মুঘল সেনাপতিকে থাকুর দুর্গ তাঁহার প্রতিনিধির হস্তে ছাড়িয়া দিতে একটা মিঠে-কড়া গোছের তাগিদ দিলেন। ‘পরে বিবেচ্য’ বলিয়া মুঘলের। সে তাগিদ উপেক্ষা করায়, বিজাপুর সুলতান নিজের সম্মুখ রাখিতে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ বোধনা করিলেন।

এই সময় শাহজী মোগল শাসন-কর্তার অশুমতি লইয়া বিজাপুর-রাজসরকারে চাকরী করিতেছিলেন। ইতঃপূর্বে দুই ফতে খাঁ সম্রাট শাহজাহানকে বহুতর হস্তী ও বহুমূল্য হীরা-জহরৎ উপহারে সম্ভব করিয়া, আহমেদনগর রাজ্যের অজিত কয়েকটি জেলায় মুর্তাজা নিজাম শাহর এক বালকপুত্রকে সুলতান বানাইয়া, সনাতন উজীরী পেশাঘ মন দিয়াছিলেন। ক্ষীরকীতে তখন মুঘলদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি বসিয়াছে। বিজাপুর সৈন্যদল পশ্চিমধ্যে কয়েকটি মোগল দুর্গ দখল করিয়া, একেবারে ক্ষীরকীর খিড়কীতে আসিয়া বানা দিল। বিজাপুরী সৈন্যদলে শাহজীও অত্যন্ত সেনাপতি ছিলেন। এই সময় সূচকুর ফতে খাঁ হতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় তাঁহার দলবল লইয়া আসিয়া, বিজাপুরী বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। চুয়াড় দিন

ধরিয়া যুদ্ধের পর, রসদ ফুরাইয়া যাওয়ায়, বিজাপুর ও আহমেদ-নগরের সম্মিলিত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফতে খাঁ ও তাঁহার হস্ত-চালিত বালক শুলতান মুঘলের হাতে বন্দী হইলেন। সোবেচারী শুলতান শেষে আজীবন গোয়ালিয়র দুর্গে আটক হইয়া রহিলেন।

বিজাপুরী সৈন্যদল কিন্তু তাহাদের শৃঙ্খলা বখাসাখ্য বজায় রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে, ধীরে ধীরে পিছু হঠিতে লাগিল। মুঘল সেনাপতি মোহকবৎ খাঁ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া অনেক দূর হঠাইয়া আনিলেন বটে, কিন্তু একটা স্থান-নিবন্ধ নিশ্চিত যুদ্ধে টানিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে সম্মুখে উচ্ছেদ করিবার সুযোগ পাইলেন না। এই সময় সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌সুজা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হইয়া আসিলেন। তখন দৌলতাবাদের অনেকাংশ একটা অনিশ্চয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে; বিজাপুরের সহিত যুদ্ধও প্রায় অচল হইয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পরে বিজাপুর-শুলতান মোহাম্মদ আদিল শাহ্‌, মোগল-অধিকৃত ভূভেদ্য পুরন্দর দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। শাহ্‌সুজা ও মোহকবৎ খাঁ দুর্গ অবরোধ করিয়া কিছু করিতে পারিলেন না। রায় বিজাপুরের আফ্‌গানী ও মারাঠী সৈন্যদলের সাপাটে অস্থির হইয়া, তাঁহারা বুরহাঁপুরে পলাইয়া গিয়া রক্ষা পাইলেন।

এই পোলমালের মধ্যে শাহ্‌জী ভেঁসলে কীর্তীতে রহিয়া গিয়া এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইয়া বসিলেন। তিনি তলে তলে কতকগুলি মারাঠী যোদ্ধা ও কেজাদারদের স্ববশে আনিয়া,

মুর্ভাজা নিজামের আর এক বালক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া, নবপ্রাপ্তপ্রাপ্ত আহ্মেদনগরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বৎসর খানেক পর্যন্ত মুঘলেরা তাঁহার উগ্র প্রতাপের কাছে ঘেঁষিতে পারিলেন না। শেষে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ককনের উত্তরার্দ্ধ এবং চন্দোর শৈলমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নীরা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য শাহজীর এলাকাভুক্ত হইয়া পড়িল; যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, বিজাপুরের প্রধান মন্ত্রী মোরার পন্থ শাহজীকে সর্ববর্ষ উৎসাহিয়া দিতেছেন, তখন সম্রাট শাহজাহান ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। আটচল্লিশ হাজার শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার সৈন্য লইয়া তিনি পুনরায় দক্ষিণাভ্যে আসিলেন। সমস্ত বাহিনী তিনি চারিদলে বিভক্ত করিয়া, সায়েস্তা খাঁ, আলিবর্দী খাঁ, খাঁ জমান ও খাঁ দৌরাণ-এর আজ্ঞাধীনে রাখিলেন। দুই দল বিজাপুর, অষ্ট দুইদল আহ্মেদনগর ঘুরস করিতে অগ্রসর হইল ( ১৬৩৫ খৃঃ অঃ )।

বিজাপুরের সহিত মুঘল-সম্রাটের এক বৎসরের উপর যুদ্ধ চলিয়াছিল। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া মুঘল সৈন্য বিজাপুরের নলদুর্গ, কল্যাণী, বিদর প্রভৃতি স্থান হস্তগত করিল; আহ্মেদনগরের নাসিক ও চন্দোর জেলা কাড়িয়া লইল। তারপর খাঁ জমান সঙ্গমনীর, চুমারগুড়ী, বড়মাট্টী প্রভৃতি একে একে অধিকার করিয়া, সসৈন্তে শাহজীর পশ্চাৎগমন করিতে করিতে, একেবারে বিজাপুরের রাজ্য-সীমানায় আসিয়া পৌঁছিলেন। শুদিকে সহ্যাদ্রির দুরারোহ শৈলগারে ত্রাশ্বক, শিউনারী,

কোন্সনা প্রভৃতি দুর্গ শাহজাদীর অনুচরগণ দখল করিয়া রাখিলেন। এদিকে শাহজাদী বিজাপুরের সৈন্য-সাহায্য পাইয়া মুঘলদের নাকের জলে চোখের জলে করিতে লাগিলেন। নিম্নলিখিত আক্রমণে সেনাপতি খাঁ জয়ান কোলাপুর, মিরাজ, রাইবাগ প্রভৃতি স্থানের হাজার হাজার নিরীহ অধিবাসীদের প্রাণবধ করিয়া, ঘর-বার জ্বালাইয়া, শস্ত লুট করিয়া, গায়ের জ্বালা মিটাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে, খাদেমশ হইতে খাঁ দৌরাগ দৌলতাবাদ, ভির, গুলবর্গী অতিক্রম করিয়া, অতর্কিতে বিজাপুর রাজধানীর অনতিদূরে আসিয়া দেখা দিলেন। মোহাম্মদ আদিল শাহ সমস্ত সৈন্য ও রাজকর্মচারী লইয়া দুর্গের ভিতর আশ্রয় লইলেন; তৎপূর্বে তিনি সাধামত শস্তসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, বাতবাকী ক্ষেত্রের উপরেই আগুণ ধরাইয়া পুড়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। খোন নদী হইতে সমস্ত নৌকা ডাঙায় উঠাইয়া তাসিয়া দেওয়া হইল। দুর্গের গভীরতম গড়খাই হইতে সমস্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া হইল। দেখিয়া-শুনিয়া দৌরাগ আর রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন না। রাজধানীর বাহিরে থাকিয়া, বিজাপুর সেনাপতি রণদৌলা খাঁর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে ও সমীপবর্তী গ্রামসমূহ দখল করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্রমে নির্বার্য হইয়া পড়িল।

মোহাম্মদ আদিল সন্ধির প্রস্তাব করিতে না করিতেই, তাহা মুঘল পক্ষ লুফিয়া লইলেন। ওই সন্ধির ফলে শোলাপুর, পুন্সবর



প্রভৃতি দুর্গ বিজাপুরকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কল্যাণ জেলা এবং ভীমার কূল হইতে চাকুন জেলা পর্য্যন্ত আব্দ-মেদনগর রাজ্যের অংশ বিশেষ বিজাপুর-রাজ উপরস্থ লাভ করিলেন। এই সকল স্থবিধা ও স্বত্ব উপভোগের জন্য বিজাপুর বাৎসরিক কুড়ি লক্ষ ‘পাগোদা’ (একপ্রকার ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রা, একটি প্রায় চারি টাকার সমান) মুঘল-রাজকোষে দিতে স্বীকৃত হইল। শাহজী নিজের অধিকারস্থ দুর্গগুলি অল্পকাল পরেই মুঘলের হাতে তুলিয়া দিলে, তিনি সম্রাটের ক্ষমা পাইবেন—এইরূপ প্রতিশ্রুতিও সন্ধিপত্রে লিখিত হইল।

ইহার পরও শাহজী কয়েক মাস অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। শেষে যখন ত্র্যম্বক, শিউনারী (জুমার), প্রভৃতি স্থানের সর্দারগণ অবরোধে হতবল হইয়া পড়িলেন, তখন শাহজী হার মানিয়া, মুঘলের নিকট মাফ চাহিলেন (১৬৩৭ খ্রঃ অব্দ)। তারপর মুঘল-সম্রাটের ইচ্ছায় তিনি বিজাপুরের চাকুরীতে পুনরায় বাহাল হইলেন এবং প্রৌঢ়বয়সে মধ্যস্থলে পৌছাইয়াও অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের দ্বিতীয় সেনাপতির পদে উন্নীত হইলেন।

আব্দ-মেদনগর রাজ্য পুরাপুরি দিল্লী সম্রাটের খাশ্ হইয়া গেল। শাহজীর স্বহস্তনির্মিত সুলতান্ বেচারী গোদাগার দ্বর্জে পূর্বের সুলতানের স্থায় চিরনির্বাসিত হইলেন।

গোলকুণ্ডার ইতিহাসের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না বাস্তবিত্বও চলিবে; কারণ ইহার অতি কম অংশেই মহারাষ্ট্র

জাতির বাস ছিল। কেবল এইটুকু জানিয়া রাখিলে চলিবে যে, গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধেও শাহজাহান অভিযান করিয়াছিলেন। কয়েকটি ছোটখাটো যুদ্ধের পর, গোলকুণ্ডা অবনত হইয়া একটা ভারী রকমের বাৎসরিক কর দিতে স্বীকার করিয়াছিল। এই রাজ্যের কিছু অংশ আহমেদনগর ও বিজাপুরের হস্তায় চলিয়া যায়। ইহার পরও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গোলকুণ্ডা রাজ্য ক্রমরূপে একরূপ টিকিয়া ছিল; তারপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব আসিয়া একেবারে ইহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিলেন।



## নবম অধ্যায়

### স্বাধীনতার বীজ-রোপণ

মুঘলের সহিত সন্ধির ফলে পুনা, সোপা, ভোর প্রভৃতি জেলা বিজাপুরের সামিল হইয়াছিল। পুনা ও সোপা জেলার শাহজীওর বিদ্রুত পৈত্রিক জায়গীর ছিল। তিনি সেগুলি ফিরিয়া পাইলেন; তাহা ছাড়া মন্ত্রী মোরার পন্থকে নবলক্ক রাজ্যান্তের বিলি-বন্দোবস্ত বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করার, শুলতানের নিকট হইতে কছবিধ ইনাম পাইলেন।

তালিকোটের যুদ্ধের পর বিজয়নগর রাজ্যের অধিকাংশ বিজাপুর, আহমেদনগর ও গোলকুণ্ডার দ্বারতঃ অধিকারে আসিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা নিয়মমত কখনও ভাগাভাগি করাও হয় নাই—তথায় শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার যথোচিত সূবন্দোবস্ত করাও হয় নাই। কাজেই এ অবস্থায় স্থানীয় জমিদারগণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজারা প্রজার বোল আনা খাজনাই তোকা ভার্য্যে ভোগ করিতেছিলেন। অতঃপর রণদৌলা খাঁ ও শাহজী একত্রে সৈন্ত লইয়া বাঙ্গালোরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত দেশে বিজাপুরের অধিকার কায়েম করিয়া আসিলেন। সেখানেও শাহজী বিভিন্ন জেলার বহু সোভনীয় জায়গীর লাভ করিলেন। উপরন্তু বর্তমান শোলাপুরের অনেক স্থান এবং কারাড্ জেলার বাইশটি গ্রাম তাঁহার

বিভক্ত জমিদারীর মধ্যে আসিয়া পড়িল। সবগুলি একত্র করিলে, একটা বেশ শাসালো রকমের রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিপুল বিজ্ঞাপুর রাজ্যে স্থলতানের নীচেই তিনজন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাসালী ব্যক্তি উহার ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন। মন্ত্রী মোরারপুত্র সেনাপতি রণদৌলা খাঁ এবং সহকারী সেনাপতি দেশনায়ক শাহজী ভোস্লে।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে শাহজী পুনরা বিবাহ করিয়াছিলেন ; কারণ যাদবদের সহিত তাঁহার মোটেই বনিবনাও ছিল না। প্রথমা পত্নী জীজীবাইয়ের গর্ভে দুই ছেলে—শত্ৰুজী ও শিবাজী। কিশোর শত্ৰুজীকে তাঁহার পিতা কর্ণাট দেশের জায়গীরগুলির তত্ত্বাবধান করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের পর জীজীবাই তাঁহার ছোট ছেলে শিবাজীকে লইয়া মাতুলালয়ে প্রস্থান করেন। দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাই মোহিতের গর্ভে শাহজীর আর এক পুত্র হইল, তাহার নাম বকজী।

জীজীবাইয়ের ললাটে স্বামীমুখ লেখা ছিল না। কুড়ি বৎসর বয়স হইতেই শাহজী, কঠোর রাজকার্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন ; একাদিক্রমে দুই মাস কাল পারিবারিক স্নিহতার মধ্যে বিভ্রাম লইবার তাঁহার অবসর ছিল না। জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধাংশই তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সূতার তৈরব কল-কোলাহলের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে লাখোজী যাদব রাও আহমেদনগরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মুঘলদের সঙ্গে যোগ দিবার সময় বেহাইবেও জামাতা

শাহজীকে মুঘলদের দলে আসিতে অনুরোধ করেন। সে কন্ডায় তাঁহার তখন কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু আমাইয়ের অবাধ্যতায় যাদব রাও হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। শাহজীও ইহার পর আর জীজীবাস্তিকে আর পিত্রালয়ে পাঠাইতে চাহেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, ১৬২৬ সালে মালেক অম্বর মারা গেলে, তাঁহার পুত্র কতে খাঁ কিছুদিন শুলতানের উপর ভীষণ প্রভুত্ব সূত্র করিয়া নিয়াছিলেন। মুঘলদের সহিত তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল এবং এই সকল যুদ্ধে তকবুল্লির্ খাঁ ও শাহজীই ছিলেন প্রধান। ১৬২৭ সালের প্রথমেই রাজধানী আহমেদনগর হইতে মুঘলদের উচ্ছেদ করিবার জন্য এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন হয়। মুঘলদের সেনাপতি ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা খাঁ জাহান লোধী যাদব রাওকে সঙ্গে লইয়া সদর্পে আসরে নামিলেন। যুদ্ধে প্রথম প্রথম আহমেদনগরীদের জয় হইতেছিল, শেষে কতে খাঁর নিকরু ক্রিয়ায় তাহাতে হার হইয়া গেল।

বীতক্রম হইয়া, শাহজী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়াই জীজীবাস্তিকে লইয়া বিজাপুরের দিকে রওনা হইগেলেন। পশ্চিমধ্যে যাদব রাও দলবল লইয়া শাহজীকে আচম্বিতে আক্রমণ করিলেন। জীজীবাস্তি তখন গর্ভবতী। জীজীবাস্তিকে ফেলিয়া, শাহজী কীর্কীর দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সাধী জীজী, স্বামীর অসুগমন করিতে চাহিলেন; কিন্তু যাদব রাও কন্ডাকে জোর করিয়া জুয়ারে লইয়া গেলেন। সেখানে শিউনারী ব্রহ্মদেশে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে

স্বসম্পত্তিবার শাহজীর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। দুর্ভেদ্য অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শিবনারী অর্থাৎ শিবীর নামে পুত্রের নাম রাখা হইল শিবাঙ্গী। বাহুদেব-সদৃশ পুত্রটিকে কোলে লইয়া, তিনি পিত্রালয়ে পরাধীনতার খালা তুলিয়া গেলেন।

তিন বৎসর পরে যাদবরাও যখন মুঘল পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় আহমেদনগর-সুলতানের দরবারে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন, তখন জীজী মুক্তি পাইলেন। বুদ্ধি এইবার স্বামিপুত্রের সহবাসে জীবনের বাকী কয়টা দির অপরিণীত সুখশান্তিতে কাটিয়া যাইবে,—এই আশায় দুঃখিনী জীজী শাহজীর সংসারে প্রবেশ করিতে না করিতেই তাঁহার এক মপত্নী আসিয়া জুটিল। চক্ষের জল মুছিয়া, তিন বৎসর বয়স্ক শিবাঙ্গীকে বুকে তুলিয়া, তিনি পুনরায় স্বামিগৃহ ছাড়িয়া চলিলেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে শাহজী যখন বিজাপুর-রাজের আমলে কর্ণাট-বিজয়ে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় জীজী বালক শিবাঙ্গীর বিবাহ উপলক্ষ করিয়া, কয়েক দিমের জন্য পুনরায় স্বামীর সংসারে আসিলেন।

মহাদ্মমদামের মধ্যে নিম্নলিখিত-কন্যা মহাবান্ধী (মথীবান্ধী)-এর সহিত দশবৎসর বয়স্ক শিবাঙ্গীর বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর পরিবারবর্ষকে পুনায় নিজ জায়গীরে পাঠাইয়া দিয়া, শাহজী কর্ণাট যাত্রা করিলেন। পুনরায় বিখ্য-সম্পত্তির তদারক করিতেন দাদাজী অণুরেও নামক এক ব্রাহ্মণ। বড় বড় জায়গীর ও জমিনারীর তত্ত্বাবধান করা ও হিসাব-খরচ রক্ষার

ভার ছিল তখন জাফলাদের উপর। ইঁহাদিগকে 'কারবুন' বলা হইত। ইঁহারা হিন্দুরাজ্যের মাওয়ানের মত সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন, প্রভুর ভরস্ হইতে রাজ-সরবারে ওকালতি করিতেও বাহিতেন।

জুয়ারের দক্ষিণ হইতে পুনর দক্ষিণ-পূর্ব পর্য্যন্ত ইন্দাপুর ও বড়মাট্টী জেলা সমেত গিরিমৌলিস্থানকে মাওয়াল বলিত; এইস্থান মাওয়ালী নামক এক পার্বত্য মারাঠা জাতির সনাতন বাসভূমি। প্রায় সমস্ত মাওয়ালটাই শাহজীর এলাকাভুক্ত ছিল। ইঁহারা হিন্দু বা মুসলমান কোন জায়গীরদারেরই বেশী দিন আত্মাধীন হইয়া থাকিতে চাহিত না। কিন্তু দাদাজী ফণসেও আপন অমায়িক ব্যবহারে মাওয়ালীদিগকে অকৃত্রিম বন্ধু করিয়া ফেলিলেন। মাওয়ালীদিগের মধ্য হইতে শিবাজীরও কয়েকজন প্রাণের বন্ধু জুটিয়া গেল।

তখন জাফল ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণী বড় একটা লেখা-পড়া শিখিত না। কচিং কোন কৃত্রিম রাজা বা প্রতিভাবান দেশমুখ একটু-আধটু লেখাপড়ার চর্চা করিতেন। জীজীবাঈ রাজবংশের মেয়ে, বহুসামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি শিবাজীকে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গীতা শ্রব করিয়া পড়িয়া শুনাই-তেন। বালকের স্মরণ-শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। দুই একবার শুনিয়াই তাঁহার বহু শ্লোক কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। দাদাজী ফণসেও অবসর পাইলেই তাঁহাকে অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন।

সীতার বনবাস-কথা শুনিয়া শিবাজী যেমন কাঁদিয়া আকুল হইতেন, আবার কর্ণাডজুঁইর বীরর কাহিনী শুনিয়া তেজস্বী আনন্দের উদ্ভাদনার অগ্নির হইয়া পড়িতেন। তরল মনসে জীবুততা ও বীরত্বের বাজ এমনি করিয়া রোপিত হইল।

কত্রিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিল তখন অস্ত্রে। দাদাজী ক্ষণদেও তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বর্শা, খড়্গ ও ক্রীড় চালনায় কিশোর বয়সেই শিবাজী একপ অদ্ভুত নৈপুণ্য লাভ করিলেন যে, দাদাজী বিশ্বাসে নির্বাক হইয়া গেলেন। মাওয়ালী যোদ্ধাগণ বর্শা-তীর-চালনায় পুরুষামুদ্রমে ওস্তাদ; তাহারা শিবাজীর অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। মাওয়ালী সর্দারের ছেলেরা আসিয়া শিবাজীকে ওস্তাদ স্বীকার করিল। অনুকূল ক্ষেত্র পাইলেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুর হইতে শিশুবৃক্ষ উল্লসিত হইয়া উঠে। দাদাজী ক্ষণদেও সাহেবের নিকট-নিজের দেশের পরাধীনতার ইতিহাস শুনিয়া বালকের প্রাণের এক নিভৃত কোণে এক টুকরা রঙ্গীন কল্পনার মেঘ ধীরে ধীরে কায়া-পরিগ্রহ করিল। ছিঃ, পরাধীন দেশের মুক্তিকায় আমার জন্ম! ইহাকে কি স্বাধীন করা যায় না?

প্রথমতঃ মাওয়ালী সর্দারের ছেলেদের সহিত মিলিয়া তিনি দূর জঙ্গলে নেকড়ে, শূকর ও ভালুক শিকারে যাইতেন। কখনও কখনও চারি পাঁচদিনের রাস্তা ও গিরি-ধরি পার হইয়া, তিনি সমলবলে বোড়ায় চড়িয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন। শেষে দুই একজন মাওয়ালী সর্দার তাঁহার মাথায় লুণ্ঠনের ধারণা ঢুকাইয়া দিল।



তাহার দলে তখন উজ্জ্বল প্রকৃতির তাত্ত্বা তাত্ত্বা যুবকও আনিয়া যোগ দিতে লাগিল। ইহারা দুই চারি জারগার হিন্দু-মুসলমান বড় লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠিত করিল। কাশাখুবা হইল যে, শিবাঙ্গীই দলবল লইয়া এই কাজ করিয়াছে। দাদাঙ্গী ও জীজী শিবাঙ্গীকে আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া জিলেন। মাকে তিনি যথেষ্ট ভক্তি করিতেন; কিছুদিন বেশ শাস্তশিষ্ট হইয়া রহিলেন।

অদুরিত বীজ মাটির অঙ্ককারে বেশীদিন মুখ সুকাইয়া থাকিতে চাহে না, বিপুল পৃথিবীর আলোকের সমারোহে সে উন্নত মস্তকে বাহির হইয়া আনিতে চাহে। শিবাঙ্গীর বয়স তখন মাত্র ষোলো। যে সময়ে আমাদের দেশের ছেলেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বইয়ের বোঝায় দিবারাত্র মুখ সুকাইয়া ডিগ্রী ও কেরানীগিরির স্বপ্ন দেখে, সেই সময় শিবাঙ্গী গোপনে তাহার তিনজন শ্রেষ্ঠ মাণ্ডালী বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, তোর্ণা দুর্গ দখল করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই তিন বন্ধু পরবর্তিকালে তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম যশজী কঙ্ক, তানাঙ্গী মালজী ও বাজী কসল্কার। ইহাদের সহায়তায়, নামমাত্র যুদ্ধ করিয়াই পুনর দশ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে তোর্ণার বিখ্যাত গিরি দুর্গ শিবাঙ্গী দখল করিয়া ফেলিলেন। যুবল দুর্গ-রক্ষক তাহার সৈন্যদল লইয়া মানে মানে সরিয়া পড়িলেন।

বৃহৎ দাদাঙ্গী কণ্ঠসেও শিবাঙ্গীকে জব্দ সনা করিলেন এবং এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি যে কী ভয়ঙ্কর হইবে, তাহাও সম্ভ্রমে

কুড়াইয়া দিলেন । কিন্তু শিবাজী বুঝিয়াও বুঝিলেন না । তাঁহার নবজাগ্রত প্রাণে তখন অকুরন্ত উৎসাহ, সর্ব অঙ্গে আত্ম-প্রসারের প্রদীপ্ত চাক্ষু্য । তাঁহার সমস্ত সত্ত্বিই যেন কুর্জটির মন্তজার নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে—

“ভাঙ্রে হৃদয় ভাঙ্রে বঁধন,  
সাধুরে আজিকে প্রাণের সাধন;  
লহরীর পর লহরী তুলিয়া  
আঘাতের পর আঘাত কর ।  
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,  
কিসের আঁধার কিসের পাষণ,  
উখলি যখন উঠেছে বাসনা,  
অগতে তখন কিসের ডর !”...

তখন বিজাপুর-রাজ কর্ণাটের শুল্কব্যাপার লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ; তদুপরি নবপ্রাপ্ত রাজ্যখণ্ডসমূহে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার কর্মচারীদেরকে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে হইতেছিল । তাঁহার বালক শিবাজীর এই উৎসাহসিকতার দণ্ড দিতে বিশেষ ব্যগ্র হইলেন না । তবে একটা কৈফিয়ৎ চাওয়ার কালে এই উত্তর পাইলেন যে, শিবাজী বিজাপুর-রাজেরই স্বার্থরক্ষার জন্য বিজা-  
দারকে ভাড়াইয়া দিয়াছেন এবং এই অঞ্চল হইতে পূর্বাপেক্ষা বেশী রাজস্ব আদায় করিয়া রাজ-সরকারে প্রেরণ করিবেন ।  
ক্ষিপ্ত ইহা একটা ঝাঁকিবাঁজী চাল যাত্র ।

ইতোমধ্যে মহা উৎসাহে বিজিত তোর্ণাচুর্গের সংস্কার-সাধন

চলিতে লাগিল। একদিন নূতন প্রাকারের ভিত্তি খুঁড়িতে খুঁড়িতে শিবাজীর লোকজন কয়েক ঘন্টা সোনা পাইল। সেই দৈবলব্ধ স্বর্ণই তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সময়ের প্রথম মূলধন হইল। এই স্বর্ণদ্বারা দুর্গ-মধ্যে ভবানী দেবীর এক মন্দির নির্মিত হইল এবং বহুতর অগ্রশস্ত্র ক্রয় করা হইল। বাকী অর্থে তোরণের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে মোরাবাদ পর্বতের উপর এক প্রকাণ্ড অজ্ঞেয় দুর্গ তৈয়ারী করা হইল। উহার নাম হইল রায়গড়।

শাহজী ভৌস্লে তখন সূদূর কর্ণাটে যুদ্ধকাণ্ডে ব্যাপৃত। পুত্রের এই রাজদ্রোহের আচরণে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; তথা হইতে রীতিমত এক কড়া চিঠি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন। “অভিভাবক দাদাজী স্বর্ণদেবও শাহজীর একখানা ভৎসনাপূর্ণ পত্র পাইলেন। একদিকে শিবাজীর—অন্যদিকে শাহজীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দাদাজী ভ্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া তিনি শিবাজীকে রায়গড় হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। মা ভবানী তাঁহার এই কিশোর শিষ্যকে দিয়া জাতির স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিতেছেন, দাদাজী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। “গো-ব্রাহ্মণ-কৃষক-কুলের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিয়া দাও, হিন্দু জাতিকে তাহার স্বপ্নমুখ জড়িমার মধ্য হইতে জাগ্রত মহিমার আলোকে টানিয়া আন, মা ভবানীর জীচরণ ভরসা করিয়া অসি হস্তে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও”—এমনি আশীর্ব্বাদ করিয়া,

শিবাজীর বাল্যভ্রমণ ও প্রিয় স্মৃতিভাস্ক নন্দর বাস ভ্রমণ করিলেন ( ১৬৪৭ খৃঃ অব্দ ) ।

দাদাজীর মৃত্যুর পর, শিবাজী সমস্ত পৈত্রিক জায়গীরের ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন ।



## দশম অধ্যায়

### শিবাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম

জায়গীরের এলাকা-মধ্যে দুইজন বিজাপুর সরকারের বিশ্বস্ত হিন্দু কর্মচারী ছিলেন ; ইহাদিগকে দলে না আনিলে অথবা তাড়াইয়া দিতে না পারিলে, শিবাজীর প্রভাপ অল্প থাকিবে না, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল । এই দুইজন ব্যক্তির একজন ছিলেন চাকুল দুর্গের অধ্যক্ষ—কিরসজী নাসাঁজা ; অপরজন শিবাজীর সহোদর, সোপা পরগণার মুকুন্দদার—বাজী মোহিতে । কুড়ি বৎসর বয়স্ক শিবাজীর উদ্যোপনায়ক বক্তৃতা ও তাঁহার অসমসাহসিক কার্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া, নাসাঁজা বিজাপুর সরকারের চাকুরীতে ইন্তকা দিয়া, তাঁহার দলে আনিয়া যোগ

দিলেন। শিবাজী পূর্বের মতই তাঁহাকে চাকুন্ দুর্গের কেল্লাদারিতে বাহাল রাখিলেন এবং উহার চতুর্দিকের গ্রামসমূহের উৎসীলদার করিয়া দিলেন।

ইহার পর একদিন শিবাজীর দলবল কোন্দনা-দুর্গ অধিকার করিতে চলিল। মুসলমান কেল্লাদার যুদ্ধ না করিয়া, একটা মোটা রকমের ইনাম চাহিলেন। বিনা রক্তপাতেই কোন্দনা অধিকৃত হইল। মোটা রকমের বক্শীশ্ পাইয়া, কেল্লাদার তাঁহার লোক-লব্ধর, অস্ত্র ও রশদ মাওয়ালাী সেনানায়কদের হাতে তুলিয়া দিয়া, হাসিমুখে চলিয়া গেলেন। শিবাজী এত দুর্গের নাম দিলেন 'সিংহগড়'।

বাজী মোহিতে কিন্তু এই উচ্ছত ভায়ে বাবাজীর নিকট মাথা নত করিতে চাহিলেন না। তখন তানাজীর নায়ককে একদল মাওয়ালাী সৈন্য গভীর নিশাথে বাজী মোহিতের কাঁড়ী ও তাঁহার তিন শত বিজাপুরী ঘোড়-সওয়ারকে আক্রমণ করিল। তাহাদের চক্ষু হইতে ঘূমের ঘোর কাটিতে না কাটিতেই তাহারা সকলে তানাজীর হস্তে বন্দী হইল। অবশেষে শিবাজী বাজী মোহিতে ও তাহার দলবলকে মুক্তি দিয়া, সে-সেনা ছাড়িয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। মোহিতের কতক মারাঠা সৈন্য শিবাজীর দলে চাকুরী লইল।

পুলা ও সোপা পরগণা শিবাজীর পুরাপুরি অধিকারে আসিল। কড়মাল্টি ও ইন্দাপুর ওহশিল্ হইতেও রীতিমত স্বাধীন্য আদায় হইতে লাগিল। সে অঞ্চলে শিবাজীর বিরুদ্ধে মাথা

তুলিবার স্পর্ধা কাহারও ছিল না। বলা বাহুল্য, শিবাজী এক পয়সা খাজনাও রাজ-সরকারে প্রেরণ করিলেন না।

মাদাজীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই বিখ্যাত পার্শ্বভ্যদুর্গ পুরন্দরের কেজাদার নীলকণ্ঠ রাণ্যের মৃত্যু হয়। তখন দুর্গের কর্তৃত্ব লইয়া তাঁহার তিন ছেলের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া উঠে। বড় ছেলে কেজাদারের পদ অধিকার করিয়া, অন্য দু'টি ভাইকে হাঁটিয়া ফেলিবার মতলব করিয়াছিলেন। উহার শিবাজীর শরণা-পন্ন হইল। শিবাজী কয়েকজন অশুচর লইয়া মধ্যরাত্রে ভাই দুই-জনের সহিত পরামর্শ করিবার অছিলায়, পুরন্দর দুর্গে গোপনে প্রবেশ করিলেন। তাহাদেরই সাহায্যে নীলকণ্ঠের বড় ছেলেকে বন্দী করা হইল ও দুর্গের অধিকাংশ সৈন্যকে তাঁহার আয়ত্তে আনা হইল। কিন্তু নীলকণ্ঠের অন্য দুইটি ছেলের হাতে তিনি দুর্গের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না; কারণ একাধিপত্য লইয়া ইহাদের মধ্যেও অচিরে বিবাদ বাধিয়া উঠা স্বাভাবিক। সুতরাং পুরন্দর দুর্গের ভার শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত অশুচরের হাতে দেওয়া হইল। ছেলে দুইটিকে তখনকার মত নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। কিছুদিন পরে শিবাজী তিন ভাইকেই মুক্তি দিয়া, কয়েকখান গ্রাম দান করিলেন।

বিনা রক্তপাতে অথবা সামান্য রক্তপাতেই শিবাজী তাঁহার পৈত্রিক জায়গীরের মধ্যে ও আশেপাশের অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে অধিকাংশ মাওয়াল-ভূমি তাঁহার বাধা হইয়া পড়িল; আত্মপ দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে-

গণও এই যুবকের অননুসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিকট নমস্কীয় হইয়া পড়িলেন। বিজাপুর-সুলতানের নিকট এ সকল সংবাদ গেলে, তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন অটে, কিন্তু প্রকাশ্যে শিবাজীকে জরুরিবার উদ্যোগ করিলেন না এই কারণে যে, শাহজী কর্ণাট্ ঘুস্কো তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন ; তাঁহার পুত্রকে এসময় শাস্তি দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। কিন্তু পিতা ও পুত্র—দুইজনের নিকটই তীব্র ভৎসনাপূর্ণ পত্র প্রেরিত হইল।

সমস্ত কঙ্কনভূমিই তখন বিজাপুরের অধিকারে। উত্তর কঙ্কন লইয়া একটা সুবা গঠিত হইয়াছিল, ইহার নাম কল্যাণ। বর্তমান কল্যাণ শহরের কয়েক ক্রোশ উত্তর হইতে পুণার বাইশ তেইশ ক্রোশ পশ্চিমে নাগধানা পর্ব্বান্ত প্রকাণ্ড ভূভাগ তখন কল্যাণ সুবার অন্তর্গত। সে সময় মোলানা আহমেদ কল্যাণের সুবাদার। তিনি সমগ্র সুবার মালগুজারি রাজধানী বিজাপুরে প্রেরণ করিতেছেন শুনিয়া, শিবাজী তাহা লুণ্ঠন করিতে মনস্থ করিলেন। তিন শত বর্গীর সৈন্য ও একদল মাণ্ডয়ালী পদাতিক লইয়া তিনি কল্যাণের খাজনারক্ষী সৈন্য দলের উপর ব্যাভিক্রমে কাঁপাইয়া পড়িলেন। কতক প্রাণ মিল, কতক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল ; সমস্ত অর্ধই শিবাজীর হস্তগত হইল। লুণ্ঠিত ধন শিবাজীর সৈন্যদলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

ক্রমাগত কৃচ্ছকার্য্যতায় শিবাজীর সাহস বাড়িয়া গেল।

শিবাজীর প্রায় সমবয়স্ক এক ভ্রাতৃপুত্র যুবক দাদাজী ফল্গুদেবের অধীনে শিক্ষা পাইয়া শিবাজীর জায়গীরে একটা লেখাপড়ার চাকুরী করিতেন। ইঁহার নাম আবাজী সন্দেও। তিনি শিবাজীর বেজায় ভক্ত ও মস্তদাতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যেমন ছিল বক্তৃতা দ্বারা মন ভিজাইবার শক্তি, তেমনি ছিল ব্যবহারিক কূটবুদ্ধি; বুদ্ধি-বিদ্যারও তিনি অল্প দিনে বিশ্লয়কর জ্ঞানলাভ করিলেন। তাঁহার পরামর্শে শিবাজী কাছাড়ী, টুঙ্গ, তিকোণ, ভুরুপ, কোয়ারি, লৌহগড়, রাজমাটি প্রভৃতি দুর্গ যৎসামান্য রক্তক্ষয়েই জয় করিতে পারিলেন। তছুপরি, যশজী, তানাজী ও বাজী কমল্কার তাঁহাদের মাওয়ালী অনুচর লইয়া, সামান্য চেষ্টাতেই গোশালা, রাইড়ী, তাল্য প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্য দুর্গগুলি অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আবাজী সন্দেও মাওয়ালী ও মারাঠীদের মিশ্রিত একদল সৈন্য লইয়া, পশ্চিমঘাট পর্বত পার হইয়া, কল্যাণ সুবায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ভীমড়ী নামক স্থানে সুবাদার মোলানা আব্দুসসম্মত খান মাল্গুজারি-লুণ্ঠনের কৃত লইয়া বিধ্ব, কাতর। হঠাৎ তাঁহার প্রদেশ আক্রান্ত দেখিয়া, তিনি একেবারে ভাবিয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ভালে করিয়া লড়িতে পারিল না। মোলানা পরাজিত ও বন্দী হইলেন। শিবাজী এই সংবাদে আনন্দ-বিহ্বল হইয়া অমতিবিলম্বে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উৎসব-উল্লাসের মধ্যে আবাজী সন্দেও কল্যাণের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। রাজ্যের দক্ষিণ দিকে



তুইটি বড় বড় দুর্গ নিশ্চয়ই ছিল। সর্বত্র প্রকারে আয় বৃদ্ধি  
খাজনা নির্ধারণ ও আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হইল। হিন্দু  
মন্দিরের জমি বড় বড় ভ্রাতৃ দান করা হইল। দেশের হিন্দু-  
মুসলমান্ মৌকশুদার, দেশমুখ ও জাহাঙ্গীরদারগণ একে একে  
আসিয়া নূতন মনিবকে নজরাণা দিতে আরম্ভ করিলেন।

মৌলানা আহমেদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি শিবাজী  
কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই ; বরং আশাতিরিক্ত ভদ্র ব্যবহার  
করিয়া, তাঁহান্নিকে প্রচুর পাথের দিয়া, রাজধানীর পথে রওনা  
করাইয়া দেন। মৌলানা আহমেদের মুখে শিবাজীর প্রচণ্ড  
দৌরাষ্ট্রের কথা শুনিয়া, মোহাম্মদ আদিল শাহ্ ক্রোধে জ্বলিয়া  
উঠিলেন। শাহ্জীর নিশ্চয়ই ইহাতে গোপন সম্মতি আছে,  
এই বিশ্বাসে সুলতান তাঁহাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবার সঙ্কল্প  
করিলেন। তখন শাহ্জী অস্বাধীভাবে কর্ণাট্ সুলার শাসন-  
কর্তার কার্য করিতেছিলেন। তিনি ইতঃপূর্বে সুলতানকে  
লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, শিবাজীর এই সকল বিদ্রোহজনক  
ব্যবহারের জন্ত তিনি বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন ; ইচ্ছা করিলে,  
সুলতান তাঁহার পুত্রকে সমন করিয়া যথাযোগ্য শাস্তি দিতে  
পারেন। এ কৈফিয়তে সুলতান্ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।  
তিনি রাজী খোড়্ ফোড়েকে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন—  
শাহ্জীকে কোশলে বন্দী করিয়া বিজাপুরে পাঠাইবার জন্ত।  
খোড়্ ফোড়ে কর্ণাট-শাসনে শাহ্জীর সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন।  
তিনি একদিন শাহ্জীকে নিজ বাসায় নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিয়া,

হঠাৎ বন্দী করিয়া ফেলিলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে তাঁহাকে বিজাপুরে পাঠাইয়া দিলেন ( ১৬৪৯ খৃঃ অব্দ ) ।

একটা অপ্রশস্ত পাখরের কুঠুরীর মধ্যে বিজাপুর-রাজের ওই মহাহিঁতৈবী ব্যক্তিটিকে বন্দী করিয়া রাখা হইল । সুলতানের হুকুমে খাজী তাঁহার পুত্রের নিকট পত্র লিখিয়া, তাহার অধিকৃত সমুদায় ভূমি ও দুর্গাদি প্রত্যর্পণ ও তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন ; নচেৎ নির্দিষ্ট সময়-অন্তে সেই অন্ধকার কারাকক্ষে বিনা খাদ্য ও পানীয়ে তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইবে । শিবাজী এই পত্র পাইয়া মহাচিন্তিত হইয়া পড়িলেন ।

পুত্রের অপরাধে পিতার প্রাণদণ্ড হইবে, ইহা কল্পনায় আনিতেও তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন । সহীবাস্ত্র বীরের পত্নী । সুলতানের নিকট তাঁহার স্বামী আত্ম-সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন জানিয়া, তাঁহাকে বিনয়বচনে বুঝাইয়া বলিলেন, “পিতার বিপদে পুত্রের চকল হওয়া স্বাভাবিক ; বিপদ হ’তে তাঁকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করাও পুত্রের কর্তব্য । কিন্তু এতদিন শত শত প্রাণ বিসর্জন দিয়া ও নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে’ যে স্বাধীনতার বীজ রোপণ কর্লে, তা’ কি এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ? পিতাকে বাঁচাবার কি আর অন্য উপায় নেই ? অন্য কোন কুহস্তর শক্তির সাহায্য নিয়ে বিজাপুর-রাজকে কি কাহিল করা যার না ?”

চমৎকার যুক্তি ! এতদিন তিনি মুঘলদের কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করেন নাই । বরং জুম্মার

শাহ্‌মেদনসর জেলার তাঁহারে যে বিঘ্নিত জমিদারী ছিল  
গত করেক বৎসর কাল তাঁহার কোন উপসব্দই মুঘল শাসন-  
কর্তাদের নিকট দাবী করেন নাই। তিনি তখনই সম্রাট-  
শাহ্‌জাহানের নিকট সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া লিখিয়া, তাঁহার  
শিতার প্রাপনকার সহায়তা করিতে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ  
করিলেন; ঐ সঙ্গে তিনি যে সম্রাটের দেবার জগ্ন সর্বদা  
প্রস্তুত—তাঁহাও জানাইয়া দিলেন।

মুঘল-সম্রাট, শাহ্‌জাহান অতীত কার্যের জগ্ন তাঁহার প্রতি  
ধুব প্রসন্ন ছিলেন না। তথাপি শিবাজীর মত একজন বীর  
মারিঠি যদি তাঁহার অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যে  
পাঠান বা হিন্দু রাজাদের ভবিষ্যৎ অবস্থাতাকে তাঁহার সহজেই  
লক্ষ্য করিতে পারিবেন—এই ভাবিয়া শাহ্‌জাহান বিজাপুর-  
শুলতানকে শাহ্‌জাহান মুক্তির অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।  
মোহাম্মদ আদিল শাহ শাহ্‌জাহানকে মুক্তি দিলেন বটে; কিন্তু  
মন্ত্রী মোরার পদে তাঁহার জামীন রহিলেন। ইহার পর তিন  
বৎসর কাল বুদ্ধ শাহ্‌জাহান এক প্রকার নজরবন্দী অবস্থায়ই  
রাজধানীতে অবস্থান করেন।

অবশেষে কর্ণাটের চতুর্দিকে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দিল।  
বিজাপুর-শুলতান শাহ্‌জাহান কর্তৃত্ব অপরাধ ক্রমা করিয়া, তাঁহাকে  
বিদ্রোহ-দমনে প্রেরণ করিলেন। কর্ণাটে কণিকাগিরির বেঙ্গা-  
দারের সতিত বুদ্ধ করিতে গিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্‌জাহান নিহত  
হন। ঐ প্রায় বৎসরব্যধিক কাল ধরিয়া বহু কষ্ট স্বাক্ষরের পর

কর্ণাটের অধিকাংশ জায়গায় কৰ্ণাট শাস্তি ফিরিয়া আসে। কিন্তু ইহার পর শিবাজীর শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। একে শত্ৰুজীর অকাল মৃত্যু, অত্মদিকে শিবাজীর বিব্রোহ ও অবাধ্যতা— তাঁহার দেহ মনকে একেবারে শব্দ করিয়া ফেলে। সেই পক্ষ দেহ লইয়াই তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত (জানুয়ারী ১৬৬৪ খৃঃ অব্দ) বিজাপুর-রাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি একবার তাঁহার মুখোন্মুলকারী সন্তানকে দেখিতে পুনায় আসিয়াছিলেন।

পিতার কর্ণাট-বাত্তার পূর্বে পর্য্যন্ত শিবাজী এক প্রকার নিষ্ক্রিয় হইয়াই ছিলেন। তারপর তাঁহার বিজয়-লিপ্সা আবার পূর্ণোন্মাদ্যে জ্বলিয়া উঠিল। জাওলীর রাজা চন্দ্ররাও মোরে বিজাপুরের এক প্রতাপশালী সামন্ত; কল্যাণ সুবার পরেই তাঁহার জমিদারী উল্লেখযোগ্য। শিবাজী ইঁহাকে দলে টানিবার জন্য বিধিভ্রষ্টা করিয়াও সকলকাম হইতে পারিলেন না। বরং তিনি তলে তলে শিবাজীর প্রশ্রয়াদেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকারের কাছে এত বড় একজন ক্ষমতাশালী শত্রুকে বজায় রাখা নিরাপদ নহে। সুতরাং ইঁহাকে দমন করা আবশ্যিক।

বল যেখানে বার্ষিক, কৌশল সেখানে চমৎকার কার্যসাধক। চন্দ্ররাওয়ের এক বিবাহযোগ্য্য স্ত্রী কন্যা ছিল। শিবাজীর জন্ত সেই কন্যাকে দেখিতে ও বিবাহের কথাবার্তা চালাইতে, পঁচিল জন ভদ্রবেশী মাওদানী ঘোড়া সাথে করিয়া; ত্রাঙ্কন কবুজী বরাদ্দ ও মারামতি-সর্বকার শত্ৰুজী কাওরাজী প্রেরিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, বিবাহের প্রস্তাব একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামি মাত্র। জাওলীর পথ-ঘাট্ ও অস্তিসন্ধি জানিয়া লওয়াই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কিছুদিন পরে বল্লাল ও কাণ্ড্যাজী খবর পাঠাইলেন যে, জাওলীর দুই একটি স্থান ছাড়া সমস্ত আট-ঘাট সৈন্যদল দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত; এমতাবস্থায় চন্দ্ররাওকে হত্যা করা ছাড়া আর উপায় নাই।

শিবাজী উত্তরে জানাইলেন, হত্যা অপেক্ষা কৌশলে বন্দী করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়; তিনি সৈন্য লইয়া, অনতিদূরেই প্রস্তুত থাকিবেন। অবিলম্বে তিনি রায়গড় হইতে পুরন্দর আসিলেন এবং দুই স্থান হইতে এক এক বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া রাতারাতি মহাবালেশ্বর পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিলেন। গুপ্তচরের সন্দেশ এড়াইবার জন্ত তিনি সামান্য কয়জন অনুচর লইয়া সম্পূর্ণ উল্টা পথে জাওলীর নিকে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন। মহাবালেশ্বর অতি দুর্গম জনশূন্য স্থান, শাপদসঙ্কুল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ; ঐস্থান হইতেই কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি। শিবাজীর সৈন্যগণ এইখানে আসিয়া লুকাইয়া রহিল। শিবাজীও ভিন্ন পথ দিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিলেন।

গভীর রজনী। রঘুজী ও শঙ্কুজী, সেই সময় চন্দ্ররাও ও তাঁহার ভ্রাতার সহিত একটা জরুরী কার্যের জন্য মাধ্যম প্রার্থনা করিলেন। প্রাসাদের চতুর্দিকে পঁচিশজন মাণ্ড্যালী যোদ্ধা উন্মুক্ত তরবারী হস্তে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। উৎসাহের আভিষেখো রাজা ও রাজভ্রাতাকে ধ্বন করিয়া,

সেই রাতে রঘুজী ও শম্ভুজী মহাবালেশ্বরের দিকে পলায়ন করিলেন।

ভোর বেলায় রাজার শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে প্রাসাদের ভিতরে-বাহিরে ক্রন্দন ও ক্রোধের একটা কুরুক্ষেত্র লাগিয়া গেল। ওদিকে শিবাজী তাহার সৈন্যবাহিনী লইয়া একযোগে জাওলীর তিনটি ঘাঁটি অবরোধ করিয়া বসিলেন। চম্পরাওয়ার দুই পুত্র ও রাজ্যের মন্ত্রী হিম্মৎরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হিম্মৎরাওয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীরও পতন হইল। ওদিকে বাশোটা ও শিউতার-খোরার দুর্গও শিবাজীর পদে প্রণত হইল। রোহিরা জেলার দেশমুখ 'বান্দ্লা' ও দেশপাণ্ডে 'বাজী পভু' মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া শিবাজীকে প্রাণপণে বাঁধা দিয়াছিলেন। শেষে যুদ্ধ করিতে করিতে বান্দলার মৃত্যু হয়। বাজী পভু সঙ্গে শিবাজীর স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। জাওলী-বিজয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। মহাবালেশ্বরের এক উচ্চ পর্বত-শৃঙ্গে শিবাজীর প্রতাপ চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয়ে প্রতাপগড় দুর্গ নিৰ্ম্মিত হইল।

খৃষ্টীয় ১৬৩৭ সালের প্রথমে কিছুদিনের জন্য শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের মোগল অধিকার-সমূহের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন। পুনরায় তিনি ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ঐ পদে বাহাল হইয়া আসিলেন। এবার গোলকুণ্ডার এক বিচক্ষণ ও কূটকৌশলী মন্ত্রী—মীর জুমলা তাহার দলে আসিয়া

তাহার দক্ষিণ হস্তধরূপ হইয়া উঠিলেন। দুইজনে মিলিয়া, গোল-কুণ্ডা ও বিজাপুরকে কি উপায়ে বাধ্ দখলে আনা যায়, তাহারই পরামর্শ আঁটিডেন। কিছুদিন পরে মীরজুমলা আগ্রায় গিয়া সাম্রাজ্যের উজীর পদে বাহাল হইলেন। তিনি সম্রাট শাহজাহানকেও দক্ষিণাত্য-বজয়ে ঘন-ঘন মন্থনা দিতে লাগিলেন।

কিন্তু একটা অছিলা ত চাই। রূপালজমে তাহাও জুটিয়া গেল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ আদিল শাহ্ দীঘকাল রোগে ভুগিয়া কবরে গিয়া শুইলেন। তাহার আঠারো বৎসর বয়স্ক পুত্র 'দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ্' নাম লইয়া মহা আড়ম্বরে বিজাপুরের সিংহাসনে বসিলেন। মোহাম্মদ আদিল শাহ্‌র বিধবা পত্নী আক্তিভাবিকা স্বরূপ রাজকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। পেশওয়ারে মোরে পন্থও কিছুদিন পরে মারা গেল, তাহার স্থলে খান্ মোহাম্মদকে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করা হইল। আফ্‌জাল্ খাঁ কর্ণাটের বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া সহকারী প্রধান সেনাপতি হইলেন। তাহার নীচেই স্থান পাইলেন দুক্‌মতি বোড়কোড়ে।

কিন্তু আগ্রা হইতে সম্রাটের এক ফার্মাণ আসিল যে, যেহেতু দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ্ ভূতপূর্ব সুলতানের বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র কিনা তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এবং যেহেতু রাজ্যভিষেকের সময় সমস্ত বাকী রাজ্যনা ও নামশতনি-নজরাণা মুঘল সরকারে জমা দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ্‌র সুলতানি বাতিল করিয়া দেওয়া

হইল ; সভ্যদের প্রতিনিধি শীঘ্রই বিজাপুরে গিয়া মুক্তন সুলতান নির্বাচন করিবেন ।...

বিজাপুর-দরবারের সকলেই ধুস্তিতে পারিল যে, বিজাপুর গ্রাস করিবার ইহা একটা গুরু মাত্র । অর্ঘনি যুবল বাহিনীকে বাধা দিবার জন্য 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল । অচিরে মীরজুমলা ও ঔরঙ্গজেব অগণন অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া, ক্ষীরকীর (এই সময় 'ঔরঙ্গাবাদে' পরিণত) পথ দিয়া, বিজাপুর-সীমান্তে কল্যাণী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । নগর-দুর্গ তখনই বিজিত হইল । তারপর বিদ্যার কেল্লাও আক্রান্ত হইল । হঠাৎ কেল্লার বারুদখানায় আগুণ লাগায় প্রায় সমস্ত বিজাপুরী সৈন্য পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল । ঔরঙ্গজেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না । তিনি 'বৈশ্রাম বিসর্জন দিয়া, গুলবর্গ' হইতে অনবরত বিজাপুর-রাজধানীর অভিমুখে আগাইয়া চলিলেন ।

মধ্যপথে থান্ মোহাম্মদ তাঁহাদের বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন ; কিন্তু হুচতুর মীরজুমলা তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া নিজের রাখিলেন । রাজধানী বিজাপুর অল্প চেষ্টায়ই মুঘলদের হাতে আসিল ( ১৬৫৭ খৃঃ অঃ ) । নবীন সুলতান ও তাঁহার মাতা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া খেনারৎখরপ এক কোটি টাকা দিতে চাহিলেন । কিন্তু ঔরঙ্গজীবের একান্ত ইচ্ছা—বিজাপুরকে ধ্বংস করা । এমন সময় আশ্রয় হইতে শাহজাহানের বাত ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হওয়ার খবর আসিয়া পৌঁছিল । ঔরঙ্গজীব তখনকার মত বিজাপুরের সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া এক কোটি টাকা



হস্তগত করিলেন এবং সৈন্যদল সহ ভাড়াভাড়ি আণা অভিযুগে যাত্রা করিলেন। ইহার পরে কি ঘটনাছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অজানা নাই। যাহা হউক, বিজাপুর মুঘলের করাল গ্রাস হইতে আপাততঃ রক্ষা পাইল। কিন্তু ঘরের কানোচে আর এক শত্রু দিন দিন রাহুর মত বাড়িয়া, মুখ-ব্যাপান করিতে লাগিল।

ঔরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়াই শিবাজী তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া সম্রাটের প্রতি তাঁহার আশুগতা নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং দাবুল ও সমুদ্র-তীরবর্তী স্থানসমূহ মুঘলদের তরফ হইয়া জয় করিয়া দিবার অশ্রুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে সে অশ্রুমতি দিয়াছিলেন এবং বিজাপুর-জয়ের নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অশ্রুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্রুমতির সুবিধা-টাই লইয়াছিলেন, অশ্রুরোধের মর্যাদাটা রক্ষা করেন নাই। বিজাপুরের পাঠান, দিল্লীর মুঘল—দুই-ই মহারাষ্ট্রের শত্রু। দুইয়ের উচ্ছেদ-সাধনই তাঁহার জীবনের ত্রুত।

ওদিকে বিজাপুরে-ঔরঙ্গজেবে যুদ্ধ লাগিয়াছে, এখানে শিবাজী নিজের কাজ গুছাইতে লাগিলেন। জুম্মার তখন মুঘল অধিকারে সমৃদ্ধিশালী শহর, তাহার দুর্গও তখন অত্যন্ত শক্তিশালী। জুম্মার আক্রমণ করিয়া তিনি তিন লক্ষ মোহর, দুই শত আরবী অশ্ব ও বহু মূল্যবান পোষাক-আশাক লুণ্ঠন করিলেন। ভূতপূর্ব রাজধানী আহমেদনগর আক্রমণ করিয়াও তিনি সাত শত ঘোড়া ও চারিটি হস্তী হস্তগত করিলেন। অতঃপর তিনি নূতন সৈন্যসংগ্রহে মন দিলেন।

শিবাজীর দলে এই সময় বহু মারাঠা শিলীদার আসিয়া যোগ দিল। তাহা ছাড়া সৃষ্টিত কয়েক সহস্র অশ্ব দিয়া তিনি বর্গীর সৈন্যও তৈয়ার করিলেন। বিজাপুর হুলতানের জবাব পাইয়া, সাত শত পাঠান পরাভিক আসিয়াও তাঁহার চাকুরী গ্রহণ করিল। রাজা চন্দ্ররাওয়ের ইত্যাকারী রঘু বল্লাল এই পাঠান দলের হাবিলদার হইলেন।

উত্তর কঙ্কন ত শিবাজীর অধিকারে পূর্ব্বেই আসিয়াছে। এইবার মুঘল বাদশাহের অমুমতির বলে বলীয়ান হইয়া তিনি দক্ষিণ কঙ্কন-জয়ে মনোযোগ দিলেন। সমুদ্র তীরবর্তী কয়েকটি জায়গা তিনি আগেই হস্তগত করিয়াছিলেন; অনেকগুলি বড় বড় নৌকা গঠন করাইয়া, পর্তুগীজদের অনুকরণে একমুদ্র জলদস্তাও মাহিনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণ কঙ্কনের তীরে তীরে তাহারা নির্ভয়ে লুটপাট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শ্যামরাজ পন্থ কিছুদিন পূর্বে শিবাজীর প্রধান মন্ত্রী বা পেশ্‌ওয়া পদে বহাল হইয়াছিলেন। একজন পাকা সেনাপতি বলিয়া তাঁহার একটু গর্ব্ব ছিল। তাঁহার অধীনে দক্ষিণ কঙ্কনে একদল মারাঠা সৈন্য প্রেরিত হইল। সেখানকার সুবাদার ফতে খাঁ শিন্দী বাঘা দিতে অগ্রসর হইলেন। শ্যামরাজ পন্থ যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিলেন; তাঁহার সৈন্য-চালনার দোষে শিবাজীর বহু সৈন্য হতাহত হইল। এমন সময় বর্ষা নামিয়া পড়ায় উভয় দলের সৈন্যই যুদ্ধ থামাইয়া দিল।

শিবাজী শ্যামরাজ পন্থের উপর ভীষণ বিরক্ত হইলেন।

তাহার সেনাপতি পক্ষও সেলই, পরন্তু পেশওয়ার পক্ষও কাড়িয়া লওয়া হইল। প্রতাপগড় দুর্গের কোম্পানীর মোরো ত্রিফল পিল্লেকে পেশওয়া নিযুক্ত করা হইল এবং বর্ধার শেষে তাহাকে ও নেতাজী ফল্কারকে সেনাপতি করিয়া দক্ষিণ কন্ধনে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যথেষ্ট বোঝা পাইয়া, তাহারা দক্ষিণ কন্ধনের কোন কোন দুর্গ জয় করিলেন বটে, কিন্তু ফতে খাঁকে একেবারে কাবু করিতে পারিলেন না।...

এদিকে দিন-রূপরে অলস বিজাপুরের ঘুম ভাঙ্গিল। শুলতান-জননীর ক্রমাগত উত্তেজনাপূর্ণ বাণী শুনিয়া, দাক্ষিণ্য সেনাপতি আফজাল খাঁ শিবাজীকে বশ করিতে যাত্রা করিলেন। তাহার অধীনে রহিল পাঁচ হাজার অশারোহী, মাত্ৰ হাজার পদাতিক ও কয়েকটি দেশী কামান ও গোলন্দাজ। আফজাল খাঁ পন্দরপুঃ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইলেন। আফজালের অধীন মুসলমান সৈন্যগণ পন্দর-পুরের মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল ও ঘাড়াটা বণিকদের ধনবস্ত্র দুই হস্তে লুটলুটি করিতে লাগিল। নিরীহ গ্রামবাসীদের গ্রীকচ্ছাদের উপরও অকণ্ঠা অত্যাচার চলিতে লাগিল।

অবশেষে প্রতাপগড় হইতে কয়েক ক্রোশ পূর্বের কৃষ্ণা নদীর তীরে বাঈ নামক স্থানে আসিয়া আফজাল শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এখন কৌশল ছাড়া আর উপায় নাই। শিবাজী আফজালের বশ্যতা স্বীকার করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং তাহার

কমার আশ্বাস পাইলে, ছদ্মবেশে হাজির হইয়া সমস্ত বিষয় নিবেদন করিবে—জানাইলেন। সুচতুর আক্‌জাল শিবাজীর চাতুরী বুঝিতে পারিলেন। তিনিও প্রকাশ্য যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে না গিয়া কোণে এই মারঠা বীরকে বন্দী বা হত্যা করিতে চাহিলেন। তিনি শিবাজীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, শিবাজী তাঁহার পুত্র সদৃশ স্নেহ-ভাজন। তিনি তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়াছেন। বিজাপুর সুলতানও বাহাতে তাঁহাকে মাক্ করেন, তাহার উপায় তিনি করিবে। আপোষে কথাবার্তা কহিবার ক্ষমতা অমুক দিন অমুক সময় শিবাজী যেন একাকী নিরঙ্কভাবে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিও তাঁহার তাবুতে একাকী থাকিবে, তবে প্রত্যেকের সঙ্গে এক একজন অস্ত্রচর থাকিতে পারে।

শিবাজী বুঝিলেন—এ শেয়ানে-শেয়ানে কোলাহুলি। তিনি সমস্ত দলবল নিকটবর্তী অরণ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। নির্দিষ্ট দিনে মাতার পায়ের ধূলা মাখায় লইয়া তিনি আক্‌জালের সহিত দেখা করিতে প্রতাপগড় দুর্গের নীচে নামিয়া আসিলেন ; সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু তানাজী মালজী। আক্‌জাল পূর্বে হইতেই মসলিনের চোগার নীচে একখানা ছোট তলোয়ার লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ; বিজাপুরী সৈন্যগণও অল্পরে গা-ঢাকা দিয়া তাঁহার সঙ্কেতধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল। বিশ্বাসঘাতকার আশঙ্কায় শিবাজীও সর্ব অঙ্গ নৌহর্ষে আবৃত্ত করিয়াছিলেন ; কোমরে 'বিষ্ণু' নামক বাঁকানো ছুরী একখানা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন

এবং অসামরিক। কনিষ্ঠাশ্রমিতে দুইটি আঁঠির মাঝার বাধবধেত  
যত ক্রম হুঁচানো অল্প লাগাইয়া লইয়াছিলেন।

শিবাজীকে দেখিরাই বিরটিকার বিজাপুরী সেনাপতি  
কুরহাস্তে দুই বাহু মেলিয়া আলিঙ্গন করিতে আসিলেন।  
আলিঙ্গনের সময় আক্কালা তাঁহার গলদেশ এক বাহু দ্বারা  
মহাকারে চাপিয়া ধরিয়া, অস্ত্র হাতখানি চোখার নীচে ঢালাইয়া  
দ্বিতেই, শিবাজী তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি  
ক্ষিপ্ৰমতিতে আক্কালালের উদর-মধ্যে বাঘনখ পুরিয়া দিবারাত্র,  
আক্কালা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তরবারি বাহির করিলেন।  
শিবাজীও তাঁহার 'বিচ্ছু' বাহির করিলেন। আক্কালালের  
তরবারি শিবাজীর দক্ষিণ বাহুতে ব্যর্থ আঘাত করিল, শিবাজী  
ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকে আত্মল ছুরিকা বসাইয়া দিলেন।  
শিবাজীর অনুচরেরা ছুটিয়া আনিয়া আক্কালালের মাথাটি কাটিয়া  
লইল। নিমেষের মধ্যে একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

তারপর দুই পক্ষই জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে  
মুদ্র করিয়া দিল। দুই পক্ষই মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিল।  
নেতাজী কল্কার যেন রণচণ্ডী-মূর্তিতে চতুর্দিকে মৃত্যুর বিভীষিকা  
ছড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বিজাপুরী সৈন্যদল  
ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষের চারি হাজার অধ, কয়েক  
শত উট, কয়েকটি হস্তী ও কয়েক বস্ত্রা মোহর শিবাজীর জয়ের  
পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল।

এই অজয়্যাশিত জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, শিবাজী

কুল্লার নদীর উত্তর পার্শ্ববর্তী কুল্ল কুল্ল পরগণা ও দুই দখল করিতে লাগিয়া গেলেন। পানাজা ও পবনগড় সহজেই তাঁহার হাতে আসিল; বসন্তগড়ও তিনি অপরূপ ক্রিয়াক্রান্তর দখল করিয়া লইলেন। তারপর রতনা ও কালনার বিখ্যাত দুর্গ দুইটি কয়েক দিন যুদ্ধের পর জয় করিলেন। শিবাজী কালনার দুর্গটির নতুন নাম রাখেন বিশালগড়।

মিরাজ জেলার কোজ্জার রোস্তাম্ জমান্ শিবাজীকে বাধা দিতে পানাজার দিকে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী তাঁহার সৈন্তের উপর কাঁপাইয়া পড়িয়া, এমন মুষ্টিযোগ কাভিলেন যে, বীর জমান্ তাঁহার জ্ঞান লইয়া পলায়নপর হইলেন। শিবাজীর অস্বারোহী সৈন্তদল তাঁহাকে কোণের পর কোণ তাড়া করিয়া লইয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গাঙ্গে ও খানার লুণ্ঠন ও খাজনা আদায় কার্যও চলিতে লাগিল। অবশেষে বিজাপুর রাজধানীর কয়েক কোশ দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া, তাহারা ফিরিয়া আসিল।

রাজধানী বিজাপুরের কানের কাছে শিবাজীর এই বিজয়-বিবরণ শুনিয়া সমগ্র রাজসভা চমকিত হইয়া উঠিল। এই কাল মাপের বিষদান্ত অচিরে ভাঙিতে না পারিলে, কোন্ দিন সে স্বাধীনতার মুকুটে ছোবল্ মারিবে।... শিবাজী তখন পানাজা দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সহসা সৈয়দ সালাবৎ খাঁর নেতৃত্বে একদল বিজাপুরী সৈন্ত গিয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিল। সেই সময় আফজলের যুবক পুত্র ফজল খাঁ আধার

নূতন একদল সৈন্য লইয়া আসিলেন। কামানের গোলায় দুর্গের দেওয়াল খসিয়া পড়িতে লাগিল, যারাষ্ট সৈন্যরা বন্দুকের ক্ষণ আওয়াজে উহাদের বজ্র-নিদা শুদ্ধ করিতে পারিল না।

শিবাজীর বেশীর ভাগ সৈন্য তখন ক্ষুদ্র দক্ষিণ কঙ্কনে; কতক সৈন্য রত্নায় ও বিশালগড়ে। এবার তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহার মাথায় একটা ফন্দী আসিল। সন্ধির প্রার্থনা জানাইয়া তিনি সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন; সালাবৎ ও ফজলু খাঁকে জানানো হইল যে, পরদিন সকালেই তিনি তাঁহার সৈন্যদল সমেত আত্মসমর্পণ করিবেন। বিজাপুরী পক্ষ নিশ্চিন্ত হইল, সৈন্যগণ ক্ষুধিত করিয়া বহুদিন পরে অঘোরে নিদ্রা গেল। মধ্য রাত্রে শিবাজী তাঁহার আড়াই হাজার সৈন্য লইয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৬৬০ খৃঃ অঃ)।

পরদিন ভোরে ব্যাপারটা জানা গেল। তখনই বিজাপুরী সৈন্যদল উজ্জ্বল চতুর যারাঠা-নায়কের অনুধাবন করিল। শিবাজী তখন বিশালগড়ের পথে। বিশালগড় হইতে আট মাইল দূরে গজপুরের নদীর্ঘ গিরি-সঙ্কটে, রোহিরের ভূতপূর্ব দেশপাণ্ডে কায়স্থ জাতীর বাজী পভুঁ এক সহস্র সাহসী সৈন্য লইয়া বিরাট বিজাপুরী বাহিনীর পথ রোধ করিতে ঠাঁড়াইয়া রহিলেন; বাকী দেড় হাজার লইয়া শিবাজী বিশালগড়ের দিকে দ্রুত কাওয়াজ করিলেন। প্রচণ্ড বিক্রমে সালাবৎ খাঁ বীর নেতা বাজী পভুঁকে আক্রমণ করিলেন,

কিন্তু তাঁহার দলকে এক পরশও হঠাইতে পারিলেন না। প্রাক্তুভক্ত বাজী পভু' আপন সৈন্যদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একাদিক্রমে নয় ঘণ্টা কাল বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সৈন্যদের উৎসাহ দিব্যর জন্ত অনর্গল চীৎকার করিয়াছিলেন। শত শত মাওয়ালী সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ দিল; শেষটা দেহের নরক্যাপে আহত হইয়া বাজী পভু'ও প্রাণ দিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর সময় শুনিয়া গেলেন যে, শিবাজী বিশালগড় দুর্গে নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন। বাজী পভু'র অনায়াস বীরত্ব-গাথা মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে দিবা জ্যোতিঃতে আজও ফোড়িত আছে, বুঝি অনন্ত কাল থাকিবে। জীক্‌ খার্মপলির যুদ্ধের সহিত গজপুরের গিরি-সঙ্কটের যুদ্ধও জগতের শ্রুতি-দেউলে চিরজাগ্রত হইয়া রহিয়াছে।

সালাবৎ খাঁ বিশালগড়ের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না; তিনি মাঝ রাস্তায় তাঁবু ফেলিয়া ইতিকর্ষবাতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্দিক্ত সুলতান আলি আদিল্‌ নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্রে আদিয়া দেখা দিলেন। কোলাপুরের শত্রুকটে পানাল্লা ও পবনগড় প্রথমেই তাঁহার হাতে আনিল। তাহা ছাড়া ঐ অঞ্চলের কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গের অধ্যক্ষরা সুলতানের নিকট একে একে আত্ম-সমর্পণ করিল। ওয়ারী জেলার দেশমুখগণও তাঁহাকে সৈন্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বর্ষার জন্ত সুলতান কিছুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

ওদিকে শিবাজী কালুনা-দুর্গ হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই



দক্ষিণ কন্ঠনের বিখ্যাত বন্দর রাজাপুর দখল করিলেন। তার পর শৃঙ্গারপুরের অর্দ্ধস্বাধীন মারাঠা-সর্কার চুলে কে প্রকাশ্য বুদ্ধে হত্যা করিয়া, তাহার স্ত্রী রাজ্যটি গ্রাস করিলেন। ইহাতে বহু হিন্দুর মনে আঘাত লাগিল। শিবাজীও অকুণ্টিত হইলেন। ইতঃপূর্বে জাওলী দখল করিতে গিয়াও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বহু হিন্দুর প্রাণসংহার করিতে হইয়াছিল। অথচ হিন্দুর স্বাধীনতার জন্তই তাঁহার এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ। এই সময় তিনি প্রতাপগড়ে ডবানীদেবীর এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহাপুরুষ রামদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গুরু রামদাস নিজের বৈরিক বহু হইতে একটা টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া, তাহাই শিবাজীর দীক্ষা-দণ্ডের উপর লাগাইয়া দেন। পরবর্ত্তিকালে শিবাজীর সমস্ত জন্ম-পতাকা গেরুয়া রঙে রঞ্জিত থাকিত। গুরু তাঁহার বীর শিষ্যকে 'স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইবে' বলিয়া আশীর্বাদ করেন। গুরু-দক্ষিণ স্বরূপ শিবাজী বিস্তৃত জায়গীর দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রামদাস স্বামী প্রদীপ চক্ষে বলেন, "বৎস, মহারাষ্ট্রের বে যে স্থান এখনও মুসলমান-কবলে আছে, তুমি সেইগুলি আমার দান ক'রো!..."

বর্ষা-শেষে শুলতান মুক্তাভিবান পুনরায় আরম্ভ করিলেন। শিবাজীও রাত্নিমত প্রস্তুত ছিলেন। স্বজাতিস্রোহী দাক্ষী ষোড়কোড়েও শুলতানের সঙ্গে ছিলেন। বিশালগড়ের

অনতিদূরেই মুখোলে ঘোড়কোড়ের প্রকাণ্ড জায়গীর । কয়েক-  
মিনিটের ছুটি লইয়া ঘোড়কোড়ে মুখোলে বেড়াইতে আসেন ।  
সংবাদ পাইয়া, শিবাজী মুখোল আক্রমণ করিলেন । ঘোড়-  
কোড়ে ও তাঁহার পরিবারবর্ষ নিহত হইলেন ;  
মুখোল পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দেওয়া হইল । এতদিনে  
পিতৃ-অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লওয়া হইল ।

প্রায় দুই বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও মুলতান আলি  
আদিল্ শিবাজীর কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিলেন না ।  
বিভিন্ন ঋণ-যুদ্ধে তাঁহার যথেষ্ট সৈন্যক্ষয়ও হইল, রাজকোষও  
অর্ধশূন্য হইল । তিনি বিরক্ত, অবসন্ন হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া  
আসিলেন । অবশেষে উজ্জীর আব্দুল মোহাম্মদ ও প্রচুড়ক  
শাহজীর মধ্যস্থতায় মুলতান্ শিবাজীর সহিত সন্ধি করিতে  
সম্মত হইলেন । শিবাজী স্বাধীন দেশনায়েক বলিয়া স্বীকৃত  
হইলেন । প্রান্ত্রে একশত মাইল ও লক্ষে একশত বাট মাইল ব্যাপী  
ভূভাগ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইল । তাঁহার  
অধীনে তখন সাতহাজার অশ্বরোহী ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার  
পদাতিক ।

এতদিনে শিবাজীর বাল্য-স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে  
চলিল ।...কিন্তু ছোট শত্রুর সহিত হিসাব নিকাশ হইল, এইবার  
বড় শত্রুর পালা !

## একাদশ অধ্যায়

### ছত্রপতি শিবাজী

ইতঃপূর্বে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি ষাণ্ঠা-  
কালে শিবাজীকে সমগ্র কন্নড় প্রদেশ অধিকার করিয়া ভোগ  
করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ অর্থর্য্য সম্রাট  
শাহজাহানকে আশ্রয় দুর্গে নজরবন্দী করিয়া, তিনি যখন নিজেই  
সিংহাসনে চড়িয়া বসিলেন, তখন সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে অবিলম্বে  
তাঁহার পদতলে আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন।  
প্রথমেই তাঁহার সৈন্যদল আচম্বিতে আসিয়া কল্যাণ-ভীম-  
অধিকার করিল। সুবাদার আবাজী সন্দেহে অপ্রস্তুত ছিলেন।  
তিনি মুঘলদের নিবারণ করিতে পারিলেন না (১৬৬১ খৃঃ অঃ)।

কালবৈশাখীর দিন পশ্চিম আকাশের এককোণে হস্তমুষ্টির  
স্তায় এক টুকরা কালো মেঘ কোথা হইতে আসিয়া বিনীতভাবে  
দেখা দেয়। খেয়ার মাঝি তাহাকে দেখিয়া হস্ত উপেক্ষার হাসি  
হাসে, বাতাসও তাহাকে দেখিয়া বোধহয় করুণা করে। তারপর  
যখন সে ধীরে ধীরে আত্মবিস্তার করিয়া, সমগ্র আকাশ ছাইয়া  
কেলে, বিশ্বগ্রাসী সংহার মৃষ্টিতে নটনাথের মত জৈরব ছন্দার  
ছাড়ে, তখন মাঝ নদীতে আসিয়া ড়ার্প মাঝি 'নামালু নামালু'  
ভাক্ ছাড়ে, ভীষ্ম স্থননে প্রভঞ্জন আসিয়া তাহার সহিত বার্থ

সংগ্রাম করে। শিবাজীরা এখন সেই অবস্থা! কোন রাজশক্তিরই ক্ষমতা নাই শিবাজীকে সহজে পরাস্ত করে। একটা-দুইটা পরাজয়ে তিনি দমিত হইবার পাত্র নহেন; বাহতে তাঁহার অশেষ বল, ছন্দয়ে তাঁহার অগাধ আত্ম-বিশ্বাস।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর-মুলতানের সহিত সন্ধি হইয়া বাইবার পরই তিনি মুঘলদিগের সহিত সরানরি যুদ্ধে নামিলেন। মোরো পন্থ ঘোর বর্ষায় একদল মাওয়ালী লইয়া জুহারের উত্তরে মুঘল অধিকৃত কতকগুলি ঘাঁটি ছাড়িয়া লইলেন। বর্ষার শেষে নেতাজী ফলকার একদল বর্গীর সৈন্য লইয়া জুহার হইতে আওরঙ্গাবাদ জেলার প্রান্ত ভাগ পর্যন্ত প্রায় একশত মাইল স্থান সূঠন ও ধ্বংস করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রয় বসিয়া ঔরঙ্গজেব কন্বক্ত হিন্দুর এই অপকার কাহিনী শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মাতুল আমীর উল্-ওমরাহ্ সায়েস্তা বীর অধীনে তৎক্ষণাৎ একদল মুঘল সৈন্য ও যশোবন্ত সিংহের অধীনে একদল রাজপুত সৈন্য, মারাঠি কান্দেরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল।

শায়েস্তা বা আসিয়া পুনা ও চাকুন জয় করিয়া লইলেন; কিন্তু সহজে নহে। ৫৬ দিন অবরোধের পর দুর্গপ্রাচীরের একাংশ যখন শায়েস্তার কামানের গোলায় ধ্বংস হইয়া পেল, তখন বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া, ফিরঙ্গী নারাজ চাকুন দুর্গরক্ষার আশা ছাড়িয়া দিলেন। পুনায় মুঘল ফৌজের একটা কেন্দ্র হইল। শিবাজী বারগড় ছাড়িয়া, সিংহগড়ে গিয়া আশ্রয়

লইলেন। পুরা নগরোতে শাহজীর সুসজ্জিত অট্টালিকার সেনাপতি শায়েস্তার বাসা-বাড়ী নির্দিষ্ট হইল। নগরীর মধ্যে কৌলদারের বিনা আদেশে কোন মারাঠার প্রবেশ-অধিকার রহিল না।

শায়েস্তা খাঁর অধীনে এক মারাঠা সেনানায়ক তাহার পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল। শিবাজীর দৃতগণ তাহাকে অর্থ দিয়া বশীকৃত করিল। বরবাজীর দল যখন বাজনা বাজাইয়া, বাজী পুড়াইতে পুড়াইতে, মোল্লাসে নগর-প্রান্ত দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন, যশজী কঙ্ক তানাজী মালম্মী ও দুই শত জন মাওয়ালী যোদ্ধা লইয়া, ছদ্মবেশে সেই বরবাজীর দলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। তারপর রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া তিনি মদলবলে শায়েস্তা খাঁর বাসা-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন রমজান মাস, মুসলমান ঐহরী ও তৃত্যগণ সারাদিন রোজার পর রাত্রে খুব একটোটা বাইয়া, নানিকা গর্জনে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রথমে বাসা-বাড়ী দিয়া তাহারা বাটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, দোতলার একটা ডাঙ্গা জানালা দিয়া একেবারে শায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে গিয়া হাজীর হইলেন। শায়েস্তা খাঁর এক বেগম জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; শায়েস্তা জাগিয়া উঠিয়া একলক্ষে জানালার ধারে আসিলেন; নীচের ঐহরীরা সচকিত হইয়া উঠিল। শিবাজীর দৃতগণ নিদ্রিত ও অর্ধ নিদ্রিত ঐহরীদের হত্যা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “তোরা বুঝি এমনি করিয়া

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পাহারা দিহু ? ৯” গোলবালের মধ্যে শায়েস্তা  
বাঁ পঙ্গাইলেন বটে, কিন্তু পলায়ন-কালে শিবাজীর তরবারের  
আঘাতে তাঁহার একটা অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। তারপর  
৬জন বাদী, ৪০ জন প্রহরী ও সায়েস্তার ছেলে আবদুল  
ফতে বাঁকে কচুকাটা করিয়া, শিবাজী অসুস্থ হুসাহসের  
পরিচয় দিয়া, রাতারাতি সিংহগড়ে ফিরিয়া আসিলেন ( ১৬৬৩,  
৫ই এপ্রিল )।

তাঁহার পিছনে পিছনে এক দল মুঘল সৈন্য তাড়া করিয়া  
সিংহগড় পর্য্যন্ত আসিল। কিন্তু দুর্গ অবরোধ করিবার সঙ্গে  
সঙ্গেই সম্মুখে দিক দিয়া নেতাজী ফলকার ও পশ্চাৎ দিক  
দিয়া কর্তাজী গুলার বাহির হইয়া, মুঘল বাহিনীকে বাঁড়াশীর  
মত টিপিয়া ধরিলেন। “কোনরূপে একটু পথ করিয়া, মুঘলেরা  
কামান-বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কর্তাজী  
তাঁহার ঘোড়-সওয়ার দল লইয়া, তাহাদের তাড়া করিয়া পুণা  
পর্য্যন্ত হটাইয়া দিলেন। শিবাজীর নিকট মুঘলের এই প্রথম  
পরাজয়।

১৬৬৪ খ্রষ্টাব্দে চারি হাজার অশ্বারোহী লইয়া শিবাজী  
মুঘল ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর সুরাট আক্রমণ করেন,  
সুরাট তখন দিল্লীর নিম্নেই সমৃদ্ধিশালী নগর। ইংরাজ

---

• “শিবাজী ও মুঘল শক্তির সংঘর্ষ”—সার হুসুনাথ সরকার, ‘প্রবাদী’  
আবাদ, ১৯১৬, ৪৩৫ পৃষ্ঠা।

বসিকল্পন করে। কংসর পূর্বে এখানে ও বোম্বাইয়ে এক-  
একটা প্রকাণ্ড উপনিবেশ ও দক্ষিণ কন্ঠন রাজ্যপুয়ে  
ও কাড়ওয়ারে এক একটা কুঠি স্থাপন করিয়াছিল।  
ক্রমাগত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরিয়া বন্দরের ঘর-বাড়ী ও জাহাজ  
লুপ্তিত হয়। ইংরাজ ও পর্তুগীজগণ নিজেদের কুঠি সামলাইবার  
জন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই চারিজন ইংরাজ ও  
শিবাজীর অমুচরদের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন; টাকা দিয়া  
তাঁহারা মুক্তি ক্রয় করেন। লুণ্ঠন-কালে মুসলমানের মসজিদ  
ও খুঁটানের গীর্জার প্রতি মারাঠারা কোনরূপ অত্যাচার করে  
নাই। তদুপরি কোন ক্ষেত্রেই স্ত্রীলোক বা বালকের প্রতি বল-  
প্রকাশ শিবাজী-সৈন্যদের নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

এই সময় শাহজীর মৃত্যু হইলে, তিনি সিংহগড়ে মহা ধূম-  
ধামের সহিত পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।  
তারপর রায়গড়ে আসিয়া প্রকাশ্য দরবারে নিজেকে রাজা  
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নামে মুদ্রা ঢালাই করিয়া,  
দেশময় প্রচলনের আদেশ জারী করা হইল। উত্তরাধিকার-  
সূত্রে তিনি পণ্ডিচেরীর দক্ষিণে পোর্টোনেভো বন্দর, তাঞ্জোর  
জেলায় বিস্তৃত জায়গীর ও আর্ণার অতিকায় দুর্গ প্রাপ্ত হইলেন।  
ওদিকে আরব্য উপসাগরে শতাধিক একপালের বড় বড় নৌকা  
ও কয়েকখানি তিন-পালের জাহাজ শিবাজীর প্রতাপ জ্ঞাপন  
করিয়া, বন্দরে বন্দরে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল। শিবাজীর  
নৌবহরের সতর্ক চক্ষু এড়াইয়া পশ্চিম উপকূল হইতে কোন

মজাদারী, যাত্রি-জাহাজই নিরাপদে বাইতে পারিত না ; মারায়ী  
 নাবিকের দল তাহাদিগকে আটক করিয়া, ধনসম্পৎশালী ভৌর-  
 যাত্রীর নিকট হইতে প্রচুর ধন-রত্ন আদায় করিত । শিবাজী  
 নিজের একবার (১৬৬৫ খ্রঃ অব্দ) ৮৮ খানি পালের জাহাজে প্রায়  
 চারি হাজার সৈন্ত লইয়া গোয়ার একশত ত্রিশ মাইল দক্ষিণে  
 বানিলোর নামক ধনশালী শহরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ।  
 নগর লুণ্ঠন করিয়া কিরিবার পথে তিনি গোবর্ধ তীর্থ (পরশুরাম-  
 ক্ষেত্র) দর্শন করেন ও ব্রাহ্মণদের বহু অর্থ প্রণামী দেন ।  
 কাডওয়ার নগরও অবরোধ করিয়া, সেখানকার অধিবাসীদের  
 নিকট হইতে চোখ আদায় করেন ; স্থানীয় ইংরাজ বণিকেরাও  
 নম্র চোখে প্রায় বোম্বো শত টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন ।

যশোবন্ত সিং ও দায়েস্তা ঝাঁকে আগ্রার ডাক্তিরা পাঠাইয়া,  
 ঔরঙ্গজেব অম্বর-অধিপতি মহারাজ জয়সিংহ ও পাঠান  
 সেনাধ্যক্ষ দিলীর ঝাঁকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজী-দমনে প্রেরণ  
 করিলেন । প্রথম প্রথম মাওয়ালী সৈন্তগণ ইহাদিগের সহিত  
 গরীলা-যুদ্ধ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন । তারপর  
 দিলীর ঝাঁকে পুরন্দর দুর্গ অবরোধের ভার দিয়া মহারাজ জয়-  
 সিংহ স্বয়ং তাঁহার রাজপুত্র বাহিনী লইয়া সিংহগড় আক্রমণ  
 করিলেন । দিনের পর দিন যুদ্ধ চলিল । ঔরঙ্গজেবের বহু-  
 যুদ্ধজয়ী সেনাপতিঘরের তেজোগর্ভ মারাঠাদের যুদ্ধ নৈপুণ্যের  
 নিকট ন্মান হইয়া গেল ।

এদিকে পুরন্দর দুর্গের হাবিলদার যোয়ার রাজী



পক্ষী হাজার হুইয়েক সেনা লইয়া, পক্ষপালসম অসংখ্য পাঠান ও মুঘল-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। সমস্তল ভূমি হইতে চৌক শত ফুট উচ্চে পাহাড়ের উপর বিখ্যাত পুরন্দর দুর্গ অবস্থিত। একশত ফুট নীচে একটা টিলার উপর দুর্গের নিম্নাংশ এবং একশত ফুট উচ্চে খাড়া পর্বতোপরে দুর্গের উচ্চাংশ; দুর্গটি যেন হোতালা। দিলীর অসহিষ্ণু হইয়া ক্রমাগত তোপ্ দাগিতে লাগিলেন এবং বারুদ দিয়া নিম্নদুর্গের গম্বুজ ও প্রান্তর-প্রাকার উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। একদিন বহু চেষ্টায় দুর্গ-প্রাকারের খানিকটা স্থান ভগ্ন হইয়া গেল। কঁক পাইয়া দলে দলে শত্রু-সৈন্য আসিয়া নিম্ন দুর্গ দখল করিয়া ফেলিল; কিন্তু উচ্চ দুর্গ তখনও মোরার বাজী প্রভুর দখলে। তিনি উপর হইতে সিংহ-বিক্রমে হোগল-পাঠানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তুমুল হাতাহাতি লড়াই লাগিয়া গেল; পাহাড়ের গারে রক্তের ঝর্ণা বহিল। প্রাকারের নিকট হস্তিপুষ্ঠে বসিয়া দিলীর ঝাঁ সৈন্যদের পরিচালনা করিতে ছিলেন। মোরার বাজী বাঁচিয়া থাকিতে সম্পূর্ণ দুর্গজয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক তীর ছুড়িলেন। মোরার বাজীর প্রাণ গেল; কিন্তু তাহার দলবল নিম্ন্ত্রাণ হইয়া পড়িল না। শেষে বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়া, দিলীর ঝাঁ সমলে ক্ষুদ্রচিত্তে নামিয়া আসিলেন।...তারপর বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল শিবির নিব্বন হইয়া পড়িল।

\* বদায়াহুলা, গজপুর যুদ্ধের বীর বাজী পক্ষীর ইনি আভর নহেন।

এহিকে কিছু সিংহগড়ের অবস্থা ভীষণ কাছিল।—সিংগড় দুর্গে বসিয়া শিখাজী তখন গভীর চিন্তাময়। রাতে তিনি এক দুঃখময় দেখিরাছেন, ভাবানী দেবী যেন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নাঙ্গি হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করিতে নিবেদন করিতেছেন; নতুবা পরাক্রম অবশ্যস্তাবী। অগ্নের কুসংস্কার তখনকার উচ্চ-নীচ সকলের মনেই একটা প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের অর্ঘ্য পাইত। তত্পরি শিখাজীর গুরু রামনাদ স্বামী তাঁহাকে হিন্দুর ঋণ-সংরক্ষণে নরকদণ্ড যত্ববান থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সামুদ্রিক অভিযানে যিয়া তাঁহার শরীর অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল; তৎকাল তাঁহার মানসিক সাম্যের অভাব হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। তিনি কয়েক জন অমাত্যের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মানজনক সর্ভে সজ্জিত প্রস্থাব করিয়া পাঠাইলেন।

জয়সিংহ এত শীঘ্র দুর্জয় মারাঠা বীরের নিকট হইতে সজ্জিত প্রস্থাব আশা করেন নাই। দূত রঘুনাথ পশু স্তায়শাস্ত্রী যখন জয়সিংহের নিকট শিখাজীর বশ্যতার বার্তা বহন করিয়া আনিলেন, তখন অস্থিরাদিপতি বিস্মিত হইলেন, সরল প্রাণে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অবশেষে শিখাজী লুকাইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অনেক কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, শিখাজী মুঘল সম্রাটের ক্ষমা-প্রার্থির অঙ্গীকারে মুঘলদের বত্রিশটি দুর্গের মধ্যে সিংহগড় ও পুরন্দর সমেত কুড়িটি দুর্গ এবং তৎসংলগ্নিত অধিকৃতগুলি ফিরাইয়া দিবেন; কেবল বিজাপুরের এলাকার অর্ধেক সমস্ত

সম্পত্তির উপর তাঁহার স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি দিল্লী-সরকারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকিবেন । তিনি ও তাঁহার অষ্টম বরস পুত্র শম্ভুজী মুঘল-সরকারে সামন্ত রাজ্যের উপযুক্ত কোন সম্মানজনক চাকুরী লইবেন ; আহমেদ-নগর ও জুন্নারে তাঁহার যে পৈত্রিক সম্পত্তি অস্ফারভাবে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে বিজাপুর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমঘাটের তরফে তিনি নূতন জমিদারি পত্তনি পাইবেন ।

ঔরঙ্গজেব এই সন্ধির খন্ডা মঞ্জুর করিয়া পাঠাইলেন এবং শিবাজীকে ক্ষমা করিয়া এক পত্র লিখিলেন ; উহাতে তাঁহাকে বিজাপুর রাজ্য-জয়ে সাহায্য করিতে এবং পরে আগ্রায় থিরা তাঁহার দরবারে সামন্তরাজ-রূপে হাজীর হইতে তরুম দেওয়া হইল ।

বিজাপুর সুলতানের খাজনা বাকী পড়িয়াছিল ; তাহা ছাড়া দরবারের ভিতর অমাত্যে-অমাত্যে ঘৃণা দলদলি ও মারামারি নিত্য লাগিয়া ছিল । এই সকল ক্রটির সুযোগ লইয়া ঔরঙ্গজেবের আদেশে জরসিংহ বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন ; শিবাজী তাঁহার আনুগত্য হাতে-কলমে প্রমাণ করিবার জন্ত জরসিংহের দহিত আট হাজার মাংগলাণী পদাতিক ও দুই হাজার বর্গী লইয়া যোগ দিলেন । সুলতান জেলা ও তাওয়ার হর্গ অল্প চেষ্টায়ই দখল হইয়া গেল । রাজধানীর অনতিদূরে মল্লবেড়া নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া জরসিংহ ও শিবাজী খাশ

বিজাপুরী সৈন্ত-বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে তাহারা টিকিতে পারিল না। সুলতান মুঘলের যথাসাধ্য দাবী মিটাইয়া কিছুদিনের মত শান্তি স্থাপন করিলেন বটে; কিন্তু জয়সিংহ তাঁহার সৈন্তদল লইয়া নিকটেই রহিয়া গেলেন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজী পাঁচশত অশ্বারোহী ও একহাজার মাওরালী পদাতিক লইয়া আত্মা বাত্মা করিলেন। বাত্মাকালে তাঁহার মাতা জীজীবাসীকে রাজপ্রতিনিধি ও পেশওয়ার মোরেশ্বর ত্রিমল্ পিঙ্গলেকে (ডাকনাম 'মোরো পম্ব') সহকারী রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া গেলেন। আবাজী সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা দত্ত নমস্ত দুর্গ ও সৈন্তদলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী হইয়া রহিলেন। দুই মাস পরে আত্মা নগর-প্রান্তে উপনীত হইয়া শিবাজী তাঁহার প্রত্যুদ্যমনের কোন উজ্জ্বল-আয়োজন না দেখিয়া একটু ক্ষুব্ধ হইলেন। তারপর দরবারে তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহদের এক পাশে বসিতে দেওয়া হইল; ইহাতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়া, শিবাজী সদন্তে আত্ম নরবার হইতে চলিয়া আসিলেন। পরদিন তিনি অনুচর সহ নিজী পরিত্যাগ করিবার প্রার্থনা করিতেই ঔরঙ্গজেব তাহা মঞ্জুর করিলেন। অনুচরগণ রওনা হইল বটে, কিন্তু শিবাজী ও শঙ্কুজী তাঁহাদের গৃহে আটক হইলেন। মুঘল সিপাহী তাঁহার বাসভবনের চতুর্দিকে পাহারা দিতে লাগিল,— বাহিরে আসিবার হুকুম নাই।

হিলাকে পুড়িয়া শিবাজী খুদে ক্রম সম্মুখে মৈর্য্যুত বা শিরশ  
 ছোঁকেন। নৃপতি শিবাজীর আশ্বাস তিনি নানারথ কন্যে আঁঠিতে  
 লানিছেন। লক্ষণে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজার্কন আঁঠু  
 করিয়া দিলেন। ঐ উপলক্ষে পরদিন প্রাতে জাহ্নবীকান্দ  
 ও রামেশ্বর ওয়ারাধিগকে বিস্তরণের ক্ষমতা বড় বেতের  
 সুবৃষ্টিতে করিয়া বিস্তার পাঠাইয়া দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম  
 সাত্ত্বীরা নেতুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের  
 পরীক্ষার কড়কড়ি শিথিল হইয়া আসিল। সুযোগ বুঝিয়া,  
 এক বৃহস্পতিবার তিনি অশ্রুশ্রদ্ধে ভাগ করিলেন; নৈদিক আর  
 পূজার্কন করা হইল না। পরের বৃহস্পতিবার শ্রুত হইয়া,  
 তিনি বিশেষ ধুমধামেব সহিত পূজার্কন করিলেন। সন্ধ্যার  
 পরই বড় বড় ওড়ার মধ্যে করিয়া নানারূপ প্রসাদ শহরের বিভিন্ন  
 দিকে চালান হইতে লাগিল। একটি ওড়ার মধ্যে শিবাজী ও  
 অন্য একটির মধ্যে শঙ্কুজী লুকাইয়া ছিলেন; কিন্তু বাহকগণ  
 জাহ্নবীকে বহন করিয়া শহরের প্রান্তভাগে গিয়া আসিল।  
 সেখানে কত কষ্টে একটা ঘোড়া যোগাড় করিয়া, শিবাজী তাঁহার  
 নর কংসর বহন পুত্রকে পশ্চাতে লইয়া, মধুরার দিকে ঘোড়া  
 ছুটাইলেন।

ফিরিবার পথে তামাজী মালশ্রী প্রমুখ কয়েকজন বিদ্রোহ অনুচর  
 শিবাজীর কদমবের সংবাদ পাইয়া, মধুরার দিয়া গিয়াছিলেন।  
 তাঁহাদের উদ্ভাবধানে শঙ্কুজীকে রাখিয়া, তিনি সন্ধ্যাসীর বেশে  
 নানা তীর্থ ঘুরিয়া নয় ঘান পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইতোমধ্যে জয়সিংহ আবার বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ কাণ্ডাইয়া  
 দিয়াছেন। তাঁহার সম্রাট-প্রভুর আদেশ—বিজাপুরকে যে-  
 কোন উপায়ে হোক মুঘল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করা। সুতরাং পুনরায়  
 বিজাপুরী রাজধানী আক্রান্ত হইল। কিন্তু জয়সিংহ পদে পদে  
 স্বাক্ষিতে লাগিলেন; অবশেষে তিনি পরাজয়ের কালিমা সর্বোচ্চে  
 মাখিয়া আশ্রয়লাভে ফিরিয়া আসিলেন। শিবাজীর  
 প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার মারাঠাদের শুল্ক শক্তি বিগুণ  
 ভেঙ্গে ফলিয়া উঠিল। শিবাজী সিংহগড়, পুরন্দর ও লৌহগড় বাদে  
 নিক জায়গীরের বাকী দুর্গগুলির একে একে পুনরুদ্ধার ও সংস্কার  
 সাধন করিলেন। কঙ্কনের কতকাংশও তাঁহার হাতে আসিল।

শিবাজী আগ্রা যাত্রা করিয়া রাষ্ট্রীয় চালে একটা মন্ত গলন্দ  
 করিয়াছিলেন। মারাঠা স্বাতির মধ্যে যখন একতার দানা  
 সবে মাত্র বীধিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্বাধীনতার ইমন  
 কল্যাণ যখন প্রাণকাতা সুরে মহারাষ্ট্রের তর্রীতে তর্রীতে  
 জাগরণের মূর্ছনা জাগাইয়াছে, তখন তাঁহার মুঘলের নিকট  
 এত অনারসে দুর্বলতার পরিচয় দেওয়াটা হয়ত উচিত হয় নাই।  
 কিন্তু সে ভুল সংশোধনের জন্ত তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।  
 এক বৎসর কালের অনুপস্থিতিতে তাঁহার অনুরক্ত অনুচরবৃন্দের  
 মনের মধ্যে কোন নৈরাস্ত্রের ছায়া পড়ে নাই, রাজ্যের মর্যাদা  
 কোথাও একটু ভাঙ্গন ধরে নাই। শুধু তাহা নহে, তাঁহার  
 কোন কর্মসেই বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই—প্রত্যেকেই  
 অবিচলিতভাবে স্বীয় কর্তব্যপালন করিতেছিলেন। বীরপ্রসবিনী

জীর্নবাসিও অশুর বুদ্ধিমত্তার সহিত পুত্রের প্রতিনিধি করিয়াছিলেন।

একটা 'মারাঠা মুখিকের' নিকট প্রবল প্রতাপাধিত দিল্লী-মন্ত্রী কুট-বুদ্ধিতে এমনভাবে পরাজিত হইলেন দেখিয়া, ঔরঙ্গজেব সত্যই হতভম্ব হইয়া গেলেন। ইহাকে দমন করিতে গেলে কতখানি তোড়জোড় করা আবশ্যিক, তিনি তাহাই দিবারাত্র চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজপুত্র মুয়াজ্জামের এক পত্র আসিল দাক্ষিণাত্য হইতে। তিনি তখন দাক্ষিণাত্যের মুঘল প্রতিনিধি, যশোবন্তসিংহ তাঁহার সহকারী ও সেনাপতি। শিবাজীর সহিত শত্রুতা না করিয়া বন্ধুত্ব করাই সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক, এই কথাই সেই পত্রে লেখা ছিল এবং কি কি সর্তে এই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে—তাহারও একটা খসড়া ঐ পত্রে দেওয়া হইয়াছিল। ইতোমধ্যে শিবাজী নিজেও একখানা পত্র মন্ত্রীকে ও একখানা পত্র যশোবন্ত সিংহকে লিখিয়া শান্তি-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব কতকটা অনিচ্ছার সহিতই কুমার মুয়াজ্জামের সুপারিশ মঞ্জুর করিলেন। তদনুসারে শিবাজীর 'রাজা' উপাধি বাদশাহ কর্তৃক স্বীকৃত হইল; পুনা, চাকুন ও সোপা জেলা এবং সিংগড় ও পুরন্দর বাদে তৎসমস্ত সমস্ত দুর্গ তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল; বেরারে তিনি এক বিশাল জায়গীর পাইলেন এবং তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র শম্ভুজী মুয়াজ্জামের অধীনে পাঁচ হাজারী মনস্বদার হইলেন ( ১৬৬৮ খ্র: অ: )

জয়সিংহের অধীনে মুঘল-সক্তির পরাজয়ে বিজাপুর-সুলতান বিশেষ খুশী হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—মুঘল বাদশাহর খজা পূর্কোপেক্ষা শাণিত হইয়া আবার তাঁহার ক্ষেপে শীঘ্রই পতিত হইবে। তিনি আশ্রয় সক্তির দরবার করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজী কুমার মুয়াজ্জাম ও বশোবস্তের নিকট এই সক্তির প্রস্তাবে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন; কারণ ইতোপূর্বে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যজয়ে মুঘলকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং মুঘল পক্ষও বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার উপর আদায়ী করের একচতুর্থাংশ ও একদশমাংশ (‘চৌথ’ ও ‘দশে-মুখী’) শিবাজীকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। শিবাজীর প্রতিবন্ধকতার পাছে সক্তি কাঁচিয়া যায়—এই ভয়ে বিজাপুরের উজীর আব্দুল মোহাম্মদ তাঁহার সহিত এক গোপন সক্তি করিয়া, বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর আলি আদিল শাহ ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে নির্দিষ্টবাদের সক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল।

গোলকুণ্ডার কুতবশাহী সুলতানও শিবাজীকে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়া, এক গোপন সক্তিপত্রে সহি করিলেন।

শিবাজীর হেঁটমুণ্ড আবার দেখিতে দেখিতে উঁচু হইয়া উঠিল, দাক্ষিণাত্যে তিনি অদ্বিতীয় ক্মতাশালী হইয়া উঠিলেন। এবার তিনি স্বজন-বিজয় সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইলেন।



প্রথমেই তাঁহার মন্ডর গেল পর্তুগীজ-অধিকৃত গোয়া ও দক্ষিণ কন্নড়ের সুরক্ষিত শ্রেষ্ঠ বন্দর জিজীরার উপর। কাম্বোজের অপ্রাচুর্য্যে ও নৌসৈন্তের উপযুক্ত বিহীন হইতে তিনি তখনকার মত গোয়া আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া, শিক্কাঁদিসের রাজধানী জিজীরার অভিমুখে এক বিরাট সৈন্তদল প্রেরণ করিলেন। বহু কষ্টে জিজীরার একাংশ লুণ্ঠিত ও অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু শিক্কাঁরা সমুদ্রের দিক হইতে যথেষ্ট প্রবল রহিয়া গেল। তখন শিবাজী স্বরাজ্যে ফিরিয়া, কিছুদিন পর্য্যন্ত চুপ্‌চাপ রহিলেন। এই সময় তিনি রাজ্যের শাসন-সংস্থানে মনোনিবেশ করিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব শান্তিতে ছিলেন না। শিবাজী-সমন্বিত গোয়া জয়লাভ হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর তিনি বৃষ্টিতে পারিলেন, কুম্ভার মুন্সাজ্জান্ ও রাজপুত-সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ শিবাজীর উৎকোচ ও উপহারের মত্রে উঠেন-বসেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই তিনি কুম্ভার মুন্সাজ্জানের নিকট এক ফার্মাণ পাঠাইয়া—শিবাজীকে, ঔরঙ্গাবাদে উপস্থিত তাঁহার রাজকৃতকে, মনস্‌দার প্রতাপরাও গুজর ও তাঁহার অন্যান্য দলপতিগণকে কৌশলে প্রেরণ করিতে সক্ষম হিলেন। কিন্তু প্রেরণের পূর্বেই খবর পাইয়া, মারাঠা-দূত নীলজী রামজী ও প্রতাপ রাও তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্ত লইয়া রাতারাতি পলায়ন করিলেন; এবং শিবাজীকে আসিয়া ঔরঙ্গজেবের দূত অভিহায় নিষেধন করিলেন।

মহারাজ-স্বামীর আতিথিহিংসা-বাক্য পুনরায় হাউ হাউ করিয়া ছড়িয়া উঠিল। মুখলের স্বাস-সাধনে তিনি মা ভবানীর নিকট কাতরভাবে কল্পনা ভিক্ষা করিলেন। বহু সাধের সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ প্রায় পাঁচ বৎসর কাল মুখলের করলে, অবিলম্বে তাহাদের উদ্ধার-সাধন করিতে হইবে। সিংহগড়েই তানাজী মালতী কয়েক বৎসর বাবৎ কেল্লাদার ছিলেন, তিনিই একদিন প্রচণ্ড সাহসে এই কেল্লা বিপক্ষের হাত হইতে হিনাইয়া লইয়াছিলেন। এক হাজার মাওয়ালী সৈন্য সাধে লইয়া, একদিন তানাজী সিংহগড় পুনরুদ্ধার করিতে রারিগড় হইতে যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণা মবমীর অঙ্ককারে গা-চাকা দিয়া, এক হাজার মাওয়ালী বোঝা বন-বিড়ালের দত্ত নিশাঙ্গে সিংহগড়ের পাক-মূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দড়ীর সিঁড়ি বাহিয়া ৩০০ সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় রাজপুত সাজীরা টের পাইয়া সিঁকা বাজাইয়া দিল। মুঘল ও রাজপুতের দুই হাজার সৈন্য তিন শত মাওয়ালীকে ঘুরার মধ্যে পাইয়া ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। অশ্লষ্ট মশালের আলোকে নির্মম পাহাড়ের বুকে ছত্কার সে কী নিষ্ঠুর রক্ত-দোলের উৎসব। মাওয়ালী মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। এমন সময় তানাজী মালতী ঞ্ণাবিদ্ধ হইয়া চিরনিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। এক শত মাত্র মাওয়ালী তখন অবশিষ্ট; মেতার পতনে তাহারা পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সেই সময় তানাজীর ছোট ভাই সূর্য্যাজী মালঞ্জী আরও তিন লক্ষ মাওয়ালী লইয়া, দুর্গমধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। পলায়নপর সৈন্তদের পথ রুদ্ধিয়া, সূর্য্যাজী বজ্রকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিলেন, “তোমরা কী সেনাপতি তানাজীর মৃতদেহ এমনি করে’ শত্রুর হাতে কেলে যাবে? তাঁহার পবিত্র দেহ কি শিয়াল কুকুরে খাবে—তাঁর হাড় ক’খানা কি মেঘর-ধাঙ্গড়ে গোর দেবে? কোন্ লজ্জায় তোমরা মহারাজ শিবাজীর কাছে গিয়ে মুখ দেখাবে? ছিঃ, মাওয়ালী বাপ্ কি তোমাদের জন্ম দেয় নি? এহু, হুজ্জ কর, জয় কর!” সূর্য্যাজীর অগ্রিমন্ত্রে ক্ষিপ্ত হইয়া মাওয়ালীরা আবার শত্রুর সম্মুখীন হইল। এই সময় অবশিষ্ট চারিশত মাওয়ালীও দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া বজ্রার মত ভিতরে প্রবেশ করিল। ‘হর হর মহাদেও’-শব্দে তাহারা চিতাবাঘের মত, খড়্গ ও কুড়ুল হস্তে, শত্রুদলের উপর কাপাইয়া পড়িল।

পরদিন রক্তের ঢেউয়ের উপর রক্তিম আলোকের পাখা মেলিয়া সূর্য্যদেব উঠিয়া সৰ্ব্ব প্রথমেই দেখিলেন—সিংহগড় মাওয়ালীদের হস্তগত। সাতশত রাজপুত ও মুঘল সৈন্ত হতাহত; মাওয়ালী পক্ষের হতাহতের সংখ্যা মাত্র তিনশত। শিবাজী সিংহগড়-বিজয়ের সংবাদে আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাল্যবন্ধু তানাজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “সিংহের গুহা ফিরে পাওয়া গেল, কিন্তু সিংহ বে নিহত! একটা দুর্গ লাভ করলুম, কিন্তু তানাজীর মত বন্ধুকে জন্মের মত হারালুম।”

ইহার একমাস পরে পুরন্দর দুর্গও পুনরধিকৃত হয়। তারপর একে একে সমগ্র কঙ্কন প্রদেশ শিবাজীর হাতে ফিরিয়া আসিল। ১৭৭০ সালে দ্বিতীয় বার সুরাট আক্রান্ত ও বন্দরের অর্দ্ধাংশ আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। ইংরাজ বণিকদের অনেকেই ধনরত্ন লইয়া পলাইয়া ছিলেন; কয়েকজন ইংরাজ শিবাজীকে উপহারেও ভুট্ট করিয়াছিলেন। তিন দিন ধরিয়া সমস্ত শহর অকাতরে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। প্রভূত ধনরত্ন সহ দেশে ফিরিবার কালে পাঁচ হাজার মোগল সৈন্য তাঁহাকে নাসিকের নিকট দুই দিক হইতে আক্রমণ করে। কিন্তু বহু কষ্টে শিবাজী সে সঙ্কট হইতে অক্ষত দেহে বামাল সমেত বাহির হইয়া আসেন।

কয়েক মাস পরে প্রতাপ রাও গুজর খান্দেশ-জয়ে বহির্গত হন। মুঘল কোজ্জানার ও কেজ্জাদারগণ সেখানেও কাবু হইয়া পড়িল। বড় বড় নগর অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হইল। এক এক জেলা হইতে সৈন্যদের খোরপোষের খরচ বাবদ মোটা মোটা 'খান্ধানি' দেশমুখদের নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করা হইল। এই অভাবানের একটা স্মরণীয় ঘটনা হইল এই যে, শিবাজীর আদেশ অনুসারে প্রতাপ রাও সমগ্র খান্দেশের উপর স্থায়ী বাৎসরিক 'চৌখ' ধাৰ্য্য করেন; অর্থাৎ প্রত্যেক মারাঠি দেশমুখ ও মুসলমান জমিদারকে ডাকাইয়া এইরূপ এক একটা কবুলিয়াৎ লিখাইয়া লইলেন যে, তাঁহারা মুঘল সম্রাটকে যে পরিমাণ কর দেন, তাহার এক চতুর্থাংশ শিবাজীকে প্রতি কিস্তিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন।

অরপর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে মহা ঐশ্বর্য  
 প্রকাশের পূর্বে প্রায়, বাঙ্গালী, মাঘধীর, মহাধীর, আউর  
 পুত্র প্রভৃতি স্বয়ংসিদ্ধ শিবাজীর রাজ্যভুক্ত হয়। অবশেষে  
 ঐরাজ্যেব সেনাপতি মহারাজ বাঁ ও দাউর বাঁর অধীনে চঞ্জি  
 হাজার সৈন্ত শিবাজী দমনে পাঠাইয়া দিলেন। কুড়ি হাজার  
 মুঘল সপক্ষে চাকর দুর্গ আক্রমণ করিয়া, দুই হাজার দুর্গরক্ষী  
 মারাঠা সৈনিককে কাটিয়া বণ্ড বণ্ড করিয়া ফেলিল। মোরো পদ্ম  
 ও প্রতাপ রাও গুজর তাজতাজি কুড়ি হাজার অশ্বারোহী লইয়া  
 মুঘলদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ছুটিয়া গেলেন। সমানে সমানে  
 যুদ্ধ—উভয় পক্ষই নাছোড়বান্দা। দুই পক্ষে শত শত সৈন্ত  
 হতাহত হইতে লাগিল। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মহারাষ্ট্রদিগের  
 গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। মুঘলগণ রণে ভয় দিল;  
 মারাঠাদের হাতে বাইশ জন নামজাদা মুঘল সেনানায়ক বন্দী  
 হইলেন।

শিবাজী শত্রুপক্ষীয় বন্দীদের প্রতি বধেষ্টে সদ্যবহার  
 করিলেন; আহতদের শুশ্রূষার যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিলেন।  
 মুঘল বীরগণ তাঁহার উচ্চ ব্যবহার দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল।  
 আহত শত্রুগণ আরোগ্যলাভ করিলে, তিনি তাহাদিগকে  
 সম্মানে মুক্তি দিলেন। কয়েক শত মুঘল ও পাঠান বন্দী  
 শিবাজীর অধীনে চাকরী লইল। এই ঘটনার পর শিবাজী-  
 দমনের আশা ঐরাজ্যেবের মনে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে  
 লাগিল।

১৬৭৩ সালে দ্বিতীয় আলি আদিল শাহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পীচ বংশের একমাত্র পুত্র সিংহাসনে বসিলেন। একইর অমাত্যদিগের মধ্যে দলাদলি চরমে উঠিল, রাজ্যশাসনেও যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই সময় শিবাজী এক এক করিয়া বিজাপুর-ভুক্ত স্থানলমুহ দখল করিতে লাগিলেন। বিজাপুরের সমস্ত কৌজ কয়েক মান প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রক্ষিতে পারিল না। কঙ্কনের নর্ক দক্ষিণ প্রান্তে ছবলী, কাড়বার, আঙ্কোলা ও সমুদ্র তীরবর্তী সমস্ত স্থান শিবাজীর নৌ-সৈন্তগণ অধিকার করিয়া ফেলিল। বেঙ্গমোরের রাজা বিজাপুরের করদ ছিলেন, তিনি ভাবগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি শিবাজীর আত্মগত্য স্বীকার করিলেন। বিজাপুর রাজ্যের বড় বড় জেলা ও নগরে শিবাজী চৌধ বসাইলেন। ইত্যপেক্ষে গোলকুণ্ডা রাজধানী আক্রমণ করিয়াও, তিনি অজয় দীরামুন্স-সোণারূপা আহরণ করিয়া আনিরাহিলেন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য এখন বস্তুতঃ শিবাজীর পদতলে। নর্মদা নদীর দক্ষিণ হইতে গোয়া পর্য্যন্ত সমগ্র মহারাষ্ট্র ভূমি তাঁহার করতলগত। কেবল দ্বিজীরা বন্দর ও তাঁহার জঙ্গভূমি জুহার—তখনও মুঘল-পাঠানের অধিকারভুক্ত। ত্রিশ বৎসর কাল দারুণ অধ্যবসায়ের ফলে তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সম্পূর্ণ হিন্দু প্রধায় যথোচিত আড়ম্বরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক কিয়ার আয়োজন করিলেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমদ্রাঙ্গা ভট্ট আসিয়া, বাগবজ্ঞ করিয়া, মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়া, বধাবিধি অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাজ্যের চতুর্দিক হইতে করদ রাজা, মোক্ষদারগণ, ভূমিদারগণ, বড় বড় রাজকর্মচারী, প্রতিপত্তিশালী বণিক ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া রাজগড়ে আসিয়াছিলেন। প্রকাশ, প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। জীজীবাঈ ও রামদাস স্বামী অভিষেক-ক্রিয়ার আগাগোড়াই নব-নির্মিত রাজদরবারে উপস্থিত থাকিয়া সকলের আদর আপ্যায়ণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে মহারাজ শিবাজীর নাম হইল, ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস ঐরাজ্যশিব ছত্রপতি মহাশয়'।

শিবাজী নিজেই সোণা দ্বারা ওজন করাইয়া, মেই দোনা স্বহস্তে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন ; লক্ষ কান্দালোকে কুরিতোজন করাইয়া, তাহাদিগকে একটি করিয়া টাকা, একখানা করিয়া বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। সেদিন শিবাজীর দীর্ঘ জীবন ও অটুট সুখ কামনা করিয়া, রাজ্যের যত হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টান প্রজা আপন-আপন ধর্ম-মন্দিরে প্রার্থনা করেন।

রাজ্যাভিষেকের পরদিন মহাত্মা রামদাস স্বামী সজ্জনগড়ে নিজ আশ্রমে কিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় ছত্রপতি শিবাজী আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, আপনাকে ত' কিছু প্রণামী দেওয়া হইল না।”

রামদাস হাসিয়া কহিলেন, “একদিন শত্রু-কবলগত স্থান-

গুলি তোমার নিকট প্রণামী চাহিয়াছিলাম। আজ সমস্ত মহারাষ্ট্র স্বাধীন। এই স্বাধীন রাজ্যের কয় কোশ জমি তুমি আমার দান করিতে পার ?”

শিবাজী উৎফুল্ললোচনে অকপট ভাবে বলিলেন, “গুরুদেব, সমস্তটুকুই পারি। পারি কেন—এই দিলাম।”—এই বলিয়া তিনি রাজবেশ খুলিয়া প্রভুর পায়ের কাছে রাখিলেন এবং একখানা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন।...রাজা হরিশ্চন্দ্রের পার্শ্বে এত বড় দানের দৃষ্টান্ত আর বুঝি দেখা যায় নাই।

রামদাস স্বামী তাঁহাকে রাজপোষাক কিরাইয়া দিয়া কহিলেন, “বৎস, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া নিষ্কামভাবে রাজ্যশাসন কর। সামান্ত অম্ভায়ে তোমার চাকুরী বাইবে। মনে থাকে কেন—তোমার প্রভু এই ভিক্ষুক, আর তোমার প্রভুর প্রভু হইলেন ঈশ্বর।”

---



## দ্বাদশ অধ্যায়

### শিবার্জীর রাজ্য-শাসন-প্রণালী ও শেষজীবন

শিবার্জী যেন যেন জানিতেন যে, জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের ফলেও তিনি সমগ্র ভারতে একটা স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিবেন না। সেইজন্য তাঁহার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মহারাষ্ট্রকে সর্বপ্রথমে স্বাধীন করা এবং সেই স্বাধীনতার বোধ এমন পাকা বনিয়াদের উপর গঠন করিয়া যাওয়া—বাহ্যতে বহুকাল ধরিয়া শত বৎসর সহস্র বস্ত্রপাতে ও উহা অটুট থাকিবে। যে সকল দেশে মহারাষ্ট্র জাতির অধিবাস নাই, সেই সকল দেশ মুঘল বা পার্শ্বদেশের নিকট হইতে জয় করিয়া, তিনি তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া লন নাই—কেবলমাত্র চৌধ ও নবদেশমুখী কর আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। নিজ রাজ্য ও পররাজ্যের মধ্যে তিনি সর্বদা একটা পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতেন।

নিজ রাজ্যে তিনি নানা বিষয়ে শাসন সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ পরস্পরের সহযোগী ও মুখাপেক্ষী ছিল। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, বেদনোর প্রভৃতি ছোটবড় কয়েকটি রাজ্য তাঁহার করদ ছিল; তাঁহার নিজের রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় তিনি নিজ মত স্থাপনের কচিং

ঠেঁট করিয়াছেন। বাথ নিজ রাজ্যের সমগ্র ভূভাগকে তিনটি ভৌকটী জেলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন; এক একটা জেলার কাম সেওয়া হইয়াছিল 'দেশ' বা 'প্রান্ত'। প্রত্যেক প্রান্তে অনেকগুলি করিয়া গিরি-দুর্গ ছিল; এই দুর্গগুলিই ছিল তাঁহার বাহ্যিক প্রাণ। সমগ্র রাজ্যে প্রায় দুই শত আশীটি দুর্গ ছিল।

প্রত্যেক দেশে কয়েকটি মহাল বা পরমণ্ডার বিভক্ত ছিল। এই পরমণ্ডার রাজ্যে আবারও কয়েকটি বংশোদ্ভূত বিভাগের কর্তব্য কর্তা ছিলেন 'তরফদার' বা 'তালুকদার'। তিনি যখন সরিভাবে রাজ্যের অধীন ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে উপভোগ্য ক্ষমতাবিশিষ্ট হইলে নির্দিষ্ট হারে বেতন পাইতেন। ইহাদের বেতন প্রায় একশত টাকা ছিল। কয়েকটি মহাল বা পরমণ্ডার উপর সুবাদার বা মামলাদার ছিলেন। তরফদারের অধীনে কাকু-গণ এক-একটা মৌজায় খাজনা আদায় করিতেন। প্রত্যেক দেশে খাজনা ভিরকালের ক্ষমতা একই হারে নির্দিষ্ট থাকিত না। মাঠে যখন শস্ত জন্মিত, কারকুনরা তখন মাঠের পরিমাপ করিয়া, উহার খাজনা ঠিক করিয়া দিতেন। প্রত্যেক প্রান্তকে, উপর শস্তের যে কাছার-দর হইত, তাহার দুই পঞ্চমাংশ খাজনা হিসাবে সরকারে সিতে হইত। বড় বড় গুহ ও বন্দরে আমদানী ও রপ্তানী মালের উপর শতকরা আড়াই টাকা করিয়া বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করা হইত। ইংরাজ, পর্তুগীজ ও ফরাসী বণিকরাও এই শুল্ক দিতে বাধ্য থাকিতেন।

প্রত্যেক প্রান্তের পাটেল ও কুল-কানী পূর্বের দ্বারা বাধ্য

রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাঁধা মাহিনায় কাঙ্ক্ষ করিতে হইল। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদের সমস্ত ক্ষমতা তিনি গোপ করিয়া দিলেন, কেবল তাহাদের পৈত্রিক জায়গীরের উপসহ ভোগ করিবার অধিকার দিলেন। জায়গীরে যে সকল প্রজা থাকিত, তাহাদের নিকট হইতে দেশমুখ কি হারে খাজনা আদায় করিবেন ও তাহার মধ্য হইতে কত অংশে রাজ-সরকারে জমা দিবেন, তাহা প্রতি বৎসর কসলের গতিক বুঝিয়া ঠিক করিয়া দেওয়া হইত। শিবাজীর বিশ্বাস ছিল—জমিদারগণ অত্যাচারে প্রজা-পীড়ন করিয়া যত্নে টাকা আদায় করেন এবং রাজ-সরকারে নামমাত্র খাজনা দিয়া একটা মোটা লাভের পরিমাণ নিজেরা উপভোগ করেন। ঐ টাকার বলে এক এক সময় দেশমুখরা এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে, রাজাকেও তুষ্ট করিতে পশ্চাৎপদ হন না। এই জন্ত ছত্রপতি নূতন করিয়া আর কোন কর্মচারীকে নকর বা নিকর জায়গীর অথবা কাহাকেও ভূসম্পত্তির ইজারা দিতেন না।

‘কেল্লাদার’ পরবোধুক্ত এক একজন মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ দুর্গের কর্তা থাকিতেন। তাঁহার অধীনে একজন ব্রাহ্মণ ‘সুব্‌নীশ্’ (বা হিসাব রক্ষক) ও একজন কায়স্থ ‘কারকাবীশ্’ (বা অস্ত্রে-শস্ত্রে রক্ষা ও রশদ-সরবরাহকারক) থাকিতেন। কারাব্রাটীর রক্ষা, দুর্গ-মেরামত এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করার জন্তও বিভিন্ন জাতীয় একদল দক্ষ কর্মচারী ছিল। প্রতি দুর্গেই একজন করিয়া বৈজ্ঞ থাকিতেন। প্রত্যেক সৈন্য নির্দিষ্টহারে মাহিনা

পাইত এবং পালা করিয়া বৎসরে দুই মাস ছুটি পাইত। হাবিলদার ব্যতীত আর কেহ পরিবার লইয়া দুর্গে থাকিতে পারিত না।

প্রতি নর জন পদাতিক সৈন্তের উপর একজন করিয়া 'নায়ক' নিযুক্ত থাকিত; প্রতি পঞ্চাশ জন সৈন্তের উপর একজন 'হাবিলদার' থাকিত। এক শত সৈন্তের উপরিস্থ কর্মচারীকে 'জুমলাদার' ও এক হাজারের উপরিস্থ কর্মচারীকে 'এক হাজারী মনসব্দার' বলা হইত। পাঁচ হাজারী মনসব্দার যখন কোন যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহাকে 'শর-ই-নৌবৎ' বলা হইত।

অম্বারোহী সৈন্তদের মধ্যে 'বর্গীর' ও 'শিল্পীদার' দুই জাতীয় সৈন্তই ছিল। শিবাজীর বিশ্বাসভাজন ও বহুকালের পরিচিত কর্মচারী দিয়া গঠিত একমল নিজস্ব বর্গীর সৈন্ত ছিল, ইহাদের নাম 'পাগাহ'। প্রতি পঁচিশ জন অম্বারোহীর উপর একজন করিয়া হাবিলদার, প্রতি একশত পঁচিশের উপর একজন করিয়া জুমলাদার এবং প্রতি ৬২৫ এর উপর একজন করিয়া সুবেদার নিযুক্ত থাকিত। ৬২৫০ জনের একটা ঘোড়সওয়ারী পল্টনের সেনাপতি ছিলেন পাঁচ হাজারী মনসব্দার।

মহারাজ শিবাজীর দি-আই-ডি অর্থাৎ গুপ্তচর বিভাগও অত্যন্ত সুদক্ষ ও সুসংবদ্ধ ছিল। এই বিভাগের বড় কর্মী ছিলেন বিহারীজী নারেক নামক এক যারাঠা ব্রাহ্মণ। বিদেশী-দের গতিবিধি, শত্রু-সৈন্তের হালচালের অনুসন্ধান, বিপক্ষদের

মধ্যে দলবদ্ধি কৃষ্টি করা অথবা সেনাধ্যক্ষদের ঘৃণা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এক দলের কাজ ছিল; আর একদলের কাজ ছিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্মচারীদের রীতি-চরিত্রের উপর নজর রাখা এবং পলাতক আসামীদের সন্ধান করা। কাহারও কোনরূপ বেচাল দেখিলে, কাহাকেও ঘৃণা বা বখশীশ আদায় করিতে দেখিলে অথবা প্রজা-পীড়ন করিতে দেখিলে, আর রক্ষা ছিল না—তাহার চাকরী লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইত। নুতন কোন কর্মচারী বাহাল হইবার সময় বিভাগীয় কর্তার পরিচিত একজন পুরাতন রাজ-কর্মচারীকে উহার বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্রতার জন্ত জামীন হইতে হইত।

সময় হইতে নিযুক্ত এক-একজন ‘মজুমদার’ পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণ, জেলার সমস্ত দুর্গ ও স্থবার বাৎসরিক হিসাব-পত্র নিখুঁতভাবে পরীক্ষা (audit) করিবার জন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। প্রতি সৈন্তদলেও একজন করিয়া মজুমদার থাকিতেন। ‘আমীন’ পদবীধারী ব্যক্তিগণ প্রজার নাম-ধাম, পেশার তালিকা, প্রয়োজনীয় দলীল-দস্তাবেজসমূহের নকল রাখিতেন ও জমা-ওয়ারীশীল-বাকীর একটা ফর্দ তৈয়ারী করিয়া সদরে পাঠাইয়া দিতেন। হিসাবের গুরুত্ব হইবার কোন জো ছিল না, কোন বিষয়ে মিতব্যয়িতার অভাব ঘটিবার উপায় ছিল না।

বৃদ্ধ বা লুণ্ঠনকালে স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধের উপর অত্যাচার করা শিবাজীর নিষেধ ছিল। গো-মহিষ ও কৃষককুল,

মারঠা সৈন্তের উৎসীড়নের আমলে কখনও আসিত না। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈন্তাধ্যক্ষ দাসী বা গণিকা হিসাবে কোন স্ত্রীলোককে লইয়া গেলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। বিজাতীয়েদের ধর্ম্মমন্দির, কবরখানা বা আশ্রমের কোন ক্ষতি সাধন করিলে নৈনিকগণ দণ্ড পাইত। লুণ্ঠনকালে কোরাণ বা শরিয়ৎ সেবিতে পাইলে, শিবাঙ্গী তাহা তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লইয়া কপালে ঠেকাইতেন ও সশস্ত্রায় সেখানি কোন মুসলমান কর্মচারীকে দান করিতেন। মুসলমান কর্মচারীরা জুম্মার নমাজ পড়িবার জন্ত শুক্রবার ছুটি পাইত। তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণী, মুসলমান ফকীরকে সমান প্রকার চক্ষে দেখিতেন এবং মন্দির মসজিদ উভয়ের জন্তই নিদ্রার জমি দান করিতেন। ঔরঙ্গজেবের দারুণ হিন্দু-বিদ্বেষ, মন্দির-ধ্বংস ও জিজিয়া করের পার্শ্বে শিবাঙ্গীর এই পরমত-সহিষ্ণুতা ও মহামুভবতা—একটা মনোরম অসামঞ্জস্য বটে!

পুনা-সন্নিকটস্থ রায়গড়ে শিবাঙ্গীর রাজধানী। দরবারের আটজন প্রধান অমাত্য একদিকে শিবাঙ্গীর পরামর্শদাতা, অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের স্থান শিবাঙ্গীর এই ‘অষ্টপ্রধানগণ’ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইহাদের সহিত সামান্য পরিচয় থাকা উচিত।

পেশ্‌ওয়া (মুখ্যপ্রধান) ছিলেন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। মোরেশ্বর ত্রিমল পিজ্‌সে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পেশ্‌ওয়া যুদ্ধে গেলে, তাঁহার সহকারী বিভাগ-পরিচালন করিতেন। ইহার পদের নাম ছিল ‘কারবারী দেওয়ান’।

প্রধান মজুমদার ছিলেন (পদ্ম অমাং) আজকালকার Finance Minister ও Auditor General-এর মত। কল্যাণের সুবাদার আবাজী সন্দেও ছিলেন প্রধান মজুমদার। ইঁহারও একজন সহকারী ছিলেন।

‘প্রধান শূরুনবীশ’ (পদ্ম সচিউ) ছিলেন হলীল-দস্তাবেজের রক্ষক, প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের ও সন্ধিপত্রের লেখক। অল্পজী দত্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার সহকর্মীর পদের নাম ছিল ফড়নবীশ্ বা ফড়নীশ্।

‘ওয়ারিয়ানবীশ্’—মহারাজের private secretaryর মত ছিলেন। তিনি পাগাহ্ সৈন্তের তদারক করিতেন, দরবারের প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন, শিবাজীর সংসার পরিচালন করিতেন এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের জবাব লিখিতেন।

প্রধান ‘শর-ই-নৌবৎ’ (সেনাপতি) ছিলেন প্রথমে দুইজন। প্রতাপ রাও শুজর ছিলেন অঝারোহী ফৌজের সর্বময় কর্তা আর বশজী কঙ্গ ছিলেন পদাতিক সৈন্তের সর্বময় কর্তা। তারপর হাখীর রাও মোহিজ্জে হুইয়াছিলেন জঙ্গীলাই বা Commander-in-Chief.

‘দবীর’ (সামন্ত) ছিলেন ইঁরাজ রাজ্যের Minister of Foreign Affairs-এর মত। সোমনাথ পদ্ম ছিলেন এই পদে অধিষ্ঠিত। দবীরের সহকারীকে বলা হইত ‘চিংনীশ্’ বা ‘চিংনবীশ্’।

‘স্তায়াধীশ’ ও ‘পণ্ডিত রাও’র ফৌজদারী ও দেওয়ানী

আইনকানুন প্রণয়ন ও সংশোধন করিতেন, ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রচার করিতেন এবং আপীলের বিচার করিতেন।...

যাহাহউক, শিবাজীর অভিষেকের এক বৎসর পরে একটা বাজে অছিলায় মুঘল-সেনাপতি দিলীর খাঁ শিবাজীর এলাকা-ভুক্ত কল্যাণ আক্রমণ করেন। এবারও শিবাজী জয়ী হইলেন। নর্মদা পার হইয়া তিনি গুজরাট-সীমানার প্রধান বন্দর ব্রোচ আক্রমণ করিয়া উহার উপর চৌধ বসান। তাঁহার নৈস্কেরা বুর্হানপুর হইতে মাদুর পর্যন্ত বিস্তৃত দেশ চঘিরা সমভূমি করিয়া ফেলে।

জিজ্ঞাসার সিদ্ধোদিগকে ও গোয়ার পর্ন্ত নীজদিগকে ভাড়াইবার জন্ত শিবাজী ঘরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; এবার যাহাতে সে চেষ্টা ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্ত তিনি সাতারা ও কোলাপুরে দুইটি প্রকাণ্ড দুর্গ তৈয়ারী করাইয়া, নৈস্ক দ্বারা ভর্তি করিলেন। করাসী বর্ষিকদিগের নিকট হইতে কয়েকটি কামানও ক্রয় করিলেন। কিন্তু সাতারায় নৈস্ক সন্নিবেশ-কালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার শরীর চিরকালের জন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। তারপর ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কর্ণাট-বিজয়ে বাহির হইবেন স্থির করিলেন। তজ্জন্ত ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৪০,০০০ পদাতিক সজ্জিত হইল।

কর্ণাটের অধিকাংশ ভূখণ্ড বিজাপুরের অধীন এবং বিজাপুর মুঘলের অনুগত। সুতরাং এই দুই শক্তির মুখ পুরাপুরি



লাগাম কবিতা রাখিতে খেলে, আর একটা রাজ্যের সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং তিনি দলবলসহ গোলকুণ্ডার তখনকার রাজধানী হায়দ্রাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৈশ্চের বহর দেখিয়া কুতবশাহী সুলতান ও তাঁহার দুই খারামী যাত্রীও বেজার ভড়কাইয়া গেলেন। তাঁহারা খুশী হইয়া শিবাজীর সহিত এক মৃতন সন্ধি করিলেন। কথা থাকিল, মুঘল বা বিজাপুরের বেরাড়া চাল দেখিলেই তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন; তারপর কর্ণাট জয় হইলে গোলকুণ্ডা তাহার একটা অংশ পুরস্কার পাইবেন।

হায়দ্রাবাদ হইতে শিবাজীর প্রকাণ্ড বাহিনী দক্ষিণে অগ্রসর হইল। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার সমন্বয়ে নদী পার হইয়া, তাঁহারা কর্ণাট রাজ্যের সোমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্বঘাটের কোল দিয়া ক্রমশঃ তাহারা কাডাপ্পা অভিমুখে চলিল। তারপর একে একে জিঞ্জী ও তুণমল্লী শ্রুবা তাহাদের হস্তগত হইল। ভেলোরের প্রসিদ্ধ দুর্গেরও পতন হইল। তারপর শিবাজী তাম্বোরের দিকে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইলেন।

ইতঃপূর্বে শাহজী বর্তমান মহীশূর রাজ্যভূক্ত কোলার, বাঙ্গালোর, এবং মাদ্রাজ প্রদেশের আশ্‌কোই, বালাপুর, সেরা ও তাম্বোর জেলার বেশী ভাগই জায়গীর রূপে পাইয়াছিলেন। এইগুলি এক করিলে নতুন একটি ছোটখাট রাজ্য হয়। ইহার সমস্ত উপস্বর্গই এতদিন শিবাজীর সংভাই বজ্জী ভোগ করিতে

ছিলেন। এখন শিবাজী ইহার জায়া অর্দ্ধাংশ মোলারেমভাবে দাবী করাতে বহুজী তাহা নিতে অস্বীকার করিলেন। তখন রক্ত চক্ষুতে ফল কলিল। বহুজী অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু কয়েক মাস পরে সুযোগ পাইয়া শিবাজীর সুবাদারকে সসৈন্তে আক্রমণ করিলেন। তাহা হইলেও, শিবাজীর জাতৃশ্রেণীর অমোঘ ক্ষমশীলতার বহুজী শেষটায় তাঁহার বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যাহা হউক, টহার পর শিবাজীর বর্গীর সৈন্তদল কর্ণাটের বড় বড় শহর, বন্দর ও গাওঁর উপর চৌধ বসাইল, নতুবা বধাসর্বস্ব লুট করিয়া উজাড় করিয়া ফেলিল। বিজাপুরের সুবাদার, কেজাদার ও করদ-রাজারা তাহাদের নিকট তৃণবৎ উড়িয়া গেল।

বিজাপুর ও মুঘলদের গতিক সুনিধার নহে জানিতে পারিয়া, কর্ণাট জয় অসম্পূর্ণ রাখিয়াই শিবাজীকে মহারাষ্ট্রে ফিরিতে হইল। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে আর একবার দিলীর খাঁর সহিত শিবাজীকে লড়িতে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত শিবাজীই জয়ী হইয়াছিলেন এবং ঔরঙ্গাবাদ নগর নিভ্ড়াইয়া তাহার সমস্ত ধনসম্পদ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বিজাপুর ও জুতপুর্ন আহমেদনগর রাজ্যের কয়েকটি প্রাদান প্রধান স্থান ও দুর্গ নিজ অধিকার-ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সারাজীবন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া, আদর্শ হিন্দু-

রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়া, এই অনন্তকর্ণা দেবচরিত্র মহিমময় বীর ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে সাতদিনের বাতঙ্করে মহাপ্রাণ করেন।

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### শিবাজীর বংশধরগণ

যে শিবাজীকে বিদেশী ঐতিহাসিকগণ নেপোলিয়ান, সীজার বা আলেকজান্ডারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুলনা করিতে কুষ্ঠা বোধ করেন নাই, সেই মহাশক্তিমান লোক-পালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জাতির স্বাধীনতার মাটিতে সকলের অলক্ষ্যে একটি গৃহ-বিবাদে বীজ আনিয়া ঠিকরিয়া পড়িল।

শিবাজীর চারি বিবাহ। তন্মধ্যে সহীবাঈয়ের সহিত আমরা পূর্বেই পরিচিত হইয়াছি। শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী (শম্ভাজী) সহীবাঈয়ের গর্ভজাত। শিবাজীর দ্বিতীয়া পত্নী সয়েরাবাঈয়ের আর একটি পুত্র জয়গ্ৰহণ করেন, তাঁহার নাম রাজারাম—তিনি শম্ভুজীর প্রায় বারো বৎসরের ছোট ছিলেন।

কিশোর বয়স হইতেই তিনি অজান্তে দুর্দান্ত ও বিংশ



শেষ শেষে গঙ্গা বিতীর্ষ বাজীরাজ ।



ঐয়লভেব ।

[সহস্রাব্দ]



প্রকৃতির ছিলেন। পিতা ক্রমাগত তিরস্কার করিয়া অথবা মিষ্ট কথায় বুকাইয়া তাঁহাকে দোরস্ত করিতে পারেন নাই। অসং সংসর্গে পড়িয়া তিনি মদ্যপান করিতে ও অস্বাস্থ্য পাপ-কার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতা একবার তাঁহাকে কড়া শাসন করিলে, তিনি ঔরঙ্গাবাদে গিয়া দিলীর খাঁর সহিত ঘোষণা দেয় এবং মুসলমানের সাহায্য লইয়া পিতাকে শাস্তি দিবে বলিয়া শাসাইতে থাকেন। বহুকষ্টে শিবাজী এই কুলান্ধার পুত্রকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, পানাজা দুর্গে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। শিবাজীর মৃত্যুর সময়ও তিনি পানাজায়। অমাত্যগণ তাঁহার দশবৎসর বয়স্ক সৎভাই রাজারামকে সিংহাসনে বসাইবার মতলব আঁটিতেছেন, এমন সময় কোনক্রমে মুক্তি পাইয়া শম্ভুজী রায়গড়ে জ্বাতিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার মুকুট একপ্রকার জোর করিয়াই নিজের মাথায় পরিলেন।

কিন্তু তিনি পিতার আসনে বসিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। রাজ্যশাসন ও সৈন্য পরিচালনের সমস্ত ভার পেশ্‌ওয়া মোরো পন্থের হাতে দিয়া তিনি সর্বদা পানাহার ও জঘন্য আমোদেই মগ্ন থাকিতেন। রাজা হইয়া তাঁহার নিষ্ঠুরতা চরমে উঠিল। তিনি রাজারামকে বন্দী করিলেন, তাহার মাতা লয়েরাবাইকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেন এবং রাজারামের দলস্থ কর্মচারীদেরকে একযোগে বন্দী বা হত্যা করিলেন। পশ্চিমচিব অন্নজী দত্ত, শিবাজীর অকৃত্রিম সেবক চিংনবীশ বজাজী ওজী প্রমুখ বহুলোক দাসত্বের খড়গ-তলে

প্রাণ দিল। পরে পেশওয়ার মোরো পক্ষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল : তাঁহার পরিবারে কুলুশা নামক এক কন্যাকী ব্রাহ্মণ—শঙ্কুজীর প্রাণের ইয়ার, পেশওয়ার দায়িত্বপূর্ব পদ গ্রহণ করিল।

রাজত্বের কয়েক বৎসর অত্যাচার ও হুখা আমোদে কাটাইয়া, শঙ্কুজীর আজ্ঞাসম্মান-বোধ ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, বীরের শোণিত তাঁহার শ্রুতি বিবেককে নাড়া দিয়া কতকটা জাগাইয়া তুলিল। তিনি পিতার পন্থা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। মৃদলগণ কল্পনে যুদ্ধাভিযান করিলে, তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। তারপর ভীমবেগে জিহ্মীরা আক্রমণ করিলেন। ওদিকে বহু গ্রাম পোড়াইয়া ও গ্রামবানীকে বলপূর্ব্বক খুষ্টান করিয়া পশ্চুগীজগণ প্রোণ্ডা অবরোধ করিলে, তিনি ভীষণ আক্রোশে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে তাহাদিগের শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া দেন।

অবশেষে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব স্বয়ং বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মহারাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে মুঘলের পদানত করিতে দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত নানা জাতীয় পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্ত পিপীলিকার সারির মত চলিতে লাগিল। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বুর্হানপুর ও আহমেদনগর হইয়া, মদগর্কী মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর প্রায় এক সপ্তাহ এই তিন রাজ্য আক্রান্ত হইল। ঔরঙ্গজেবের রাগ সব চেয়ে বেশী মহারাষ্ট্রের

উপর : একে হিন্দুরাজ্য—তার বিজোহী বাদশাহ-পুত্র মুহাম্মদ আকবর শত্ৰুজীর নিকটে আনিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। যুদ্ধে একবার মুঘল পক্ষ হারেন, একবার মহারাষ্ট্র পক্ষ হারেন। একবার শত্ৰুজীর সৈন্যদল বুদ্ধ সেনাপতি হাযীর রাওয়ের নেতৃত্বে ব্রোচ্ হইতে বুর্হানপুর পর্যন্ত শত শত মাইল ভূভাগ লুণ্ঠন করিয়া, ছালাইয়া দিল। আবার মুঘলরা কখনের কতকগুলি নগর দখল করিয়া, অমুসলমান প্রজাদের উপর জিজিয়া নামক অতিরিক্ত কর জোর করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর এবং ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা রাজ্য বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের স্বাস্থ্যদুর্বেল আসিল; নাক্ষিণাত্যে পাঠান রাজত্বের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত লোপ পাইল। তারপর ঔরঙ্গজেবের দিগ্বিজয়ের তোড়জোড় ও কৃতকার্যতার প্রথম পরিচয় পাইয়া কোন কোন মহারাষ্ট্র মনুষব্দার সম্রাটের দলে গিয়া চাকুরী লইল; কোন কোন সুবেদার আবার তলে তলে ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। ইহার আর একটা প্রধান কারণ ছিল; শত্ৰুজীর না ছিল ব্যক্তিত্বের প্রভাব, না ছিল রাজ্যশাসনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অধ্যবসায়। তাহা ছাড়া, অপদার্থ কুলুশার পেশ্ ওয়াগিরিতে অনেকেই স্বাধীনতা-রক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে কোলাপুরের নিকটে সজ্জেশ্বর নামক স্থানে শত্ৰুজী তাঁহার পেশ্ ওয়া ও চাক্ষশঙ্কন অনুচর সহ হঠাৎ মুঘলের হাতে ধরা পড়িলেন। ঔরঙ্গজেব তখন পুনর বোম্বে



মাইল উত্তরপূর্বে তোলাপুরের ছাউনীতে অবস্থান করিতেছিলেন । বন্দীগণকে সেখানে আনিয়া কয়েদ করা হইল । ঈরাজ্জেব শত্ৰুজীকে জানাইলেন, “তুমি এখন আমার বন্দী, তোমার প্রাণ এখন আমার করায়ত্ত । তুমি যদি সদলে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে মুক্তি পাইবে ; নচেৎ কঠিন হত্যা তোমার নিশ্চিত ।”

শত্ৰুজী জানাইলেন “বেয়াদব ধর্ম্মাঙ্ক বাদশাহ, তোমার কন্টার সহিত যদি আমার বিবাহ দাও, তাহা হইলে আমি ইসলাম গ্রহণ করার কথা ভাবিয়া দেখিতে পারি ।” তারপর মহাপুরুষ হজরৎ মুহাম্মদকে জবন্ত ভাষায় গালি পাড়িলেন ।

ঈরাজ্জেব ক্রোধে দাবায়ির মত ঝলিয়া উঠিলেন । তাঁহার আদেশে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য বাজারের ভিতর দাতকেরা হস্তপদবদ্ধ শত্ৰুজীর চক্ষুদ্বয় তত্ত্ব লৌহ শলাকা দ্বারা উন্মূল্য হইয়া ফেলিল ; তারপর তাঁহার জিহ্বা টানিয়া ছিঁড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল ।

রাজারাম এতদিন বন্দী অবস্থায় রায়গড়ে ছিলেন । শত্ৰুজীর ছয় বৎসরের পুত্র দ্বিতীয় শিবাজী বা সর্দাকে সিংহাসনে বসাইয়া, রাজরামকে তাঁহার অভিভাবক ও রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল । যাহারা এতদিন শত্ৰুজীর স্বাভাবিক মৃত্যু চাহিতেছিলেন, তাঁহারাও মুঘলের হাতে তাঁহার এই বৃশংস হত্যার সংবাদে অশ্রু মোচন করিয়া, তাঁহার প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ।

মহারাষ্ট্র মুঘলপতিগণ সম্মিলিত হইয়া কাৰ্য্যক্ষেত্রে নামিবার সঙ্কেত দেই চতুর্দিক দিক হইতে মুঘলগণ তাঁহাদের জীকিয়া ধরিল। রাজারাম বিশালগড় দুর্গ পরিদর্শনে গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ একদল মুঘল আসিয়া রাস্তাঘাটে হানা দিল। শত্ৰুজীর বিধবা পত্নী ও বালক শিবাজী বন্দী হইয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট নীত হইলেন। ঔরঙ্গজেবের কস্তা শত্ৰুজীর পত্নীর সহিত বেশ ভাব জমাইয়া লইলেন। শিবাজীর ওই শিশু পৌত্রটিকে দেখিয়াই বৃদ্ধ মুঘল সজ্ঞাচ্যেব কেমন মমতা জন্মিল। তিনি তাহার ‘সাহ’ নাম দিয়া, তাহাকে সঙ্গেহে নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন।

রাজারাম বিপন্ন মহারাষ্ট্রের ভার রামচন্দ্র পঞ্চ বাণরীকার ও প্রধান সেনাপতি মহাদেওজী নারকের হস্তে দিয়া, অস্ত্রাস্ত্র অমাত্য, কয়েকজন বিশ্বস্ত অমুচর ও একদল বৈসম্ম সমেত স্বদূর কর্ণাটে পলাইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞীতে গিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেখানে গিয়াও নিস্তার নাই। অচিরে জিজী মুঘল কর্তৃক আক্রান্ত হইল এবং কয়েক বৎসরের নানা বিপর্ষ্যের পর অধিকৃত হইল। কিন্তু রাজারাম তাঁহার দলবল সহ পলায়ন করিলেন। ইতোমধ্যে মহারাষ্ট্রে মুঘলরা অনেকগুলি দুর্গ দখল করিয়াছিল এবং অনেক-গুলি শূবা হস্তগত করিয়াছিল; পুনা জেলার ত্রিশোমানায় আর মারাঠী স্বাধীনতার চিহ্নমাত্র রহিল না। এই সময়ে সেনাপতি মহাদেওজী নারকের মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রীগণ আরও হতাশ হইয়া পড়িল।

কিন্তু রামচন্দ্র পক্ষ এই সম্বন্ধকালে বিচ্ছিন্নপ্রায় মহারাষ্ট্র সর্দারদের এক করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। তিনি সাতারায় তাঁহার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, মারাঠী সৈন্যদিগকে সংহত করিতে লাগিলেন। তারপর কয়েকটি মুঘল বাঁটি আক্রমণ করিয়া বাহা কিছু ধনরত্ন পাইলেন, সেগুলি সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের উৎসাহ সজীবিত করিয়া রাখিলেন। এমন সময় গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের মহারাষ্ট্র সেনানলের নেতৃদ্বয় শাজাজী ঘোড়ফোড়ে ও খান্নাজী যাদব তাঁহাদের নিতর্ন্য সৈন্যদল সমেত আগিয়া রামচন্দ্রের সহিত যোগ দিলেন। মহারাষ্ট্র দলে আবার উদ্দীপনার স্রোত বহিতে লাগিল।

মেরীচ, বাই, কোলাপুর, পানাজা, রায়গড় প্রভৃতি স্থানে আবার মহারাষ্ট্রের পৈরিক পতাকা উড়িল; আবার চতুর্দিক হইতে ঔরঙ্গজীব নিশ্চিষ্ট হইতে লাগিলেন। এমন সময় জিজী হইতে রাজারাম বিশালগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। রামচন্দ্র পক্ষের পরামর্শে রাজারাম তাঁহার রাজধানী সাতারায় স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় ত্রিবাঙ্গুর হইতে বম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল ভাগ মহারাষ্ট্র নৌবহরের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া উঠিল। পর্তুগীজ, দিনেমার, ইংরাজ, ফরাসী ও জিজীরানি নিকীদেব জাহাজে দিনে-রুপরে মারাঠী বোম্বেটেরা রাহাজানি করিতে লাগিল। সমুদ্র তীরবর্তী বহু দুর্গ তাহাদের হস্তগত হইল। বোম্বাইয়ের নিকট কোলাবায় শিবাজী একটা নৌবহরের মাডা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন; এখন উহাকে যথেষ্ট সম্বল

ও সুরক্ষিত করা হইল। বোম্বাইয়ের ইংরাজরা এই ব্যাপারে একটু ভীত হইয়া পড়িলেন।

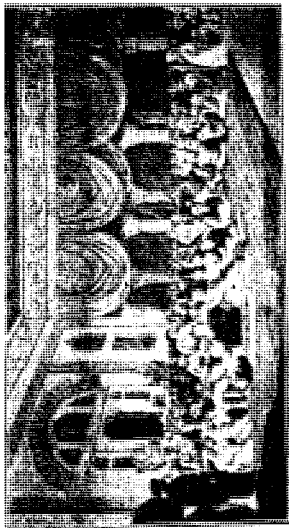
১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজারাম কয়েকজন দুর্ভীষ সেনাপতি লইয়া উত্তর কন্ঠনের বহুস্থান জয় করিয়া লইলেন; খান্দেশ, বেরার, বাগলানা ও গঙ্গাধুরি আক্রমণ করিয়া চৌধ ও সর্দেশমুখী কর স্থাপন করিলেন। যে সকল মুঘল ফৌজদার প্রতিরোধের চেষ্টা করিলেন, তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলা হইল। তাহারা পুরা বা আংশিক ভাবেও চৌধ দিতে পারিল না, তাহারা কিস্তিবন্দী খং লিখিয়া দিল। এই সকল চৌধ কড়াহ-গুণায় আদায় করিবার জন্ত, রাজারাম নরকপ্রথম ঐ সকল দেশে এক একটা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এক একজন ওস্তাদ সেনাপতির অধীনে এক দল করিয়া শরীর লৈলু রাখিয়া আঁবিলেন।

এদিকে ঔরঙ্গজেব, পুত্র আজিম সাহকে লইয়া সাতারা-দুর্গ আক্রমণ করিলেন ( ১৭০০ খৃঃ অঃ )। কয়েক মাস অবরোধ ও যুদ্ধের পরে মারাঠা সৈন্যরা, দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, মুঘল ব্যাঘ্ৰ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; শূন্য দুর্গ নব্বাটের হস্তগত হইল। এই সময় রাজারাম মরণাপন্ন হইয়া উত্তরাপথ-অভিযান হইতে নিঃসংকে ফিরিয়া আসিলেন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার দশ বৎসরের ছেলে তৃতীয় শিবাজী মহারাষ্ট্রের গদীতে বসিলেন; তাঁহার বীরমাতা তারাবাই মোহিতে অজিতাবক হইলেন।

কোন পরাজয়ই মহারাষ্ট্রদের উৎসাহ হ্রাস করিতে পারিল

না। নানা দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা মুঘল অধিকারে উৎপাত  
 আরম্ভ করিল। বারবার ঔরঙ্গজেবের তোষাখানি লুট হইল।  
 পানামা, বসন্তগড়, পবনগড়, সাতারা প্রভৃতি আবার তাহারা  
 হস্তগত করিল। টাকার আদায় হইতে লাগিল, অথচ এই পার্শ্বভা-  
 য়মুখিকদের জয় করা গেল না। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা নর্মদা  
 নদী পার হইয়া, মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিয়া, চৌধ ও  
 সরদেশমুখী কর আদায় করিল। ফিরিবার পথে পুনরায়  
 বুর্হানপুর, বেরার ও খান্দেশ লুট করিল। হাজার হাজার গ্রাম,  
 শত শত মুঘল ছাউনী পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া দিল। কুড়ি  
 বৎসরের উপর দক্ষিণাত্যে থাকিয়া ঔরঙ্গজেব অধীর হইয়া  
 পড়িলেন। ওদিকে দিল্লীতে তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে,  
 এদিকে জীবন-প্রদীপও নিবু-নিবু হইয়া আসিয়াছে। ১৭০৭  
 সালে ঔরঙ্গজেব আহমেদনগরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর সাহু মুক্তি পাইয়া মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া  
 আসিলেন। তাঁহার সিংহাসনের দাবী তারাবাজি উড়াইয়া  
 দিলেও সাহু জোর করিয়া সাতারার আসিয়া সিংহাসন  
 অধিকার করিলেন (১৭০৮)। মহারাষ্ট্র দলপতিদের মধ্যে ঘরোয়া  
 বিবাদের সূত্রপাত হইল। কিন্তু প্রতাপাধিপতি সেনাপতি  
 খান্নাজী খাদব সাহুর পক্ষে বোণ দেওয়ান, তারাবাজির পক্ষ  
 হুর্কল হইয়া পড়িল। তারপর তারাবাজির পুত্র তৃতীয় শিবাজী  
 বসন্ত রোগে মারা গেলে, সকলে মনে করিল—বুঝি এইবার  
 ঘরোয়া বিবাদের ইতি হইল। কিন্তু রামচন্দ্র পন্থ কোলাপুরে





একটা নতুন রাজ্যপাট সৃষ্টি করিয়া, রাজ্যারামের দ্বিতীয়া পত্নীর মর্জ্বাত পুত্রকে দ্বিতীয় শম্ভুজী নাম দিয়া, মহারাষ্ট্রের রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দাদিগাতের মূল শাসন-কর্ত্তা চিনি কুলোচ ধী নিজাম-উল-মুল্ক দ্বিতীয় শম্ভুজীর দাবী স্বীকার করিয়া, মহারাষ্ট্রের দলাবলির আশুপ তালো করিয়া খুঁচাইয়া তুলিলেন।

সেনাপতি ধারাজীর এক ব্রাহ্মণ কারকুন ছিলেন—তঁাহার নাম বালাজী বিঘনাথ ভাঁট,। একটা বিরাট প্রতিভা তঁাহার মধ্যে লুকাইয়া ছিল। দুর্জয় সাহসকে পরিত্যাগ করিয়া যখন প্রধানগণ কোলাপুরের পক্ষে বোগদান করিতে লাসিলেন, তখন এই কারকুন তঁাহাকে সং পরামর্শ দিয়া আশাবিত্ত করিয়া তুলিলেন। ইহারই কন্দকুলতায় সাহস পক্ষ ক্রমশঃ বলবত্তর হইয়া উঠিল এবং যারাঠা-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিছুদিন পরে বালাজী বিঘনাথ পেশ্ওয়া পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ সাহস ব্যক্তি হ্রাস করিয়া কেলিলেন। সাহ বিলাসপ্রিয় ও শান্তিকামী ছিলেন। তিনি গান-বাজনা, তান-পাশা এবং মংস্ত ও পঙ্ক-শীকারেই সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করিতে লাগিলেন বালাজী বিঘনাথ।



## চতুর্দশ অধ্যায়

### পেশওয়ার শাসন

#### প্রথম পেশওয়ার—বালাজী বিদ্যনাথ

কেরোক্‌নার তখন দিল্লীর সত্রাট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন সৈয়দ বংশীর দুই ভ্রাতা—উজীর আব্দুল্লা খাঁ ও সেনাপতি হোসেন আলি খাঁ। হোসেন আলি মারাঠাদিগকে দমন করিবার জন্য দাক্ষিণাত্রে আসিলেন, কিন্তু ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসুখে উঠিতে পারিলেন না। কেরোক্‌নার হোসেন আলিকে ভয় করিতেন ও তাঁহার কর্তৃত্বকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি গোপনে মহারাষ্ট্রদিগকে হোসেন আলির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন।

পেশওয়ারে বালাজী বিদ্যনাথ এখন মহারাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ; তিনি শঙ্করজী মলহরের সহায়তায় হোসেন আলিকে এক সুবিধাজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে রাজী করাইলেন। ইহার দ্বারা সাহ দাক্ষিণাত্যের ছয়টি বড় বড় শ্রবা হইতে চৌধ ও সর্দেশমুখী কর আদায় করিতে পারিবেন, এবং শিবাজী পূর্বে যে সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ্য বলিয়া

ফেরৎ পাইবেন। সাহু ইহার পরিবর্তে দুঘল সরকারে দল লক্ষ টাকা কর দিবেন এবং পনের হাজার মারামি সৈন্ত দিবেন। কিন্তু ফেরোকসারার এ সন্ধিপত্র বাস্তবায়ন করায় হোসেন আলি অপরাহ্ন হইয়া পড়িলেন। তাৎপর্য ফেরোকসারারের গুপ্ত অভিসন্ধি টের পাইয়া, এক দল মারাঠা সৈন্ত ভাড়া করিয়া গিয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈন্তদলের কর্তা হইয়া চলিলেন শেখ ওয়াশাকী বিশ্বনাথ ও খুশু রাও দ্বাবাফে।

ফেরোকসারারের দলবল পরাজিত ও সন্নাট নিহত হইলেন। মারাঠা সৈন্তদের সহায়তায় সৈয়দ-আব্দুল্লাহ আবার রাজধানীর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মুলতান মুরাজ্জামের পৌত্র মোহাম্মদ শাহকে দিল্লীর তক্ত-তাউসে বসাইয়া দিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মোহাম্মদ শাহ পূর্ব সন্ধিপত্রে গ্রহীতা হিসাবে স্বাক্ষর করিলেন। বিজয় গর্ভে উৎফুল্ল হইয়া শেখ ওয়াশাক সান্তারায় কিরিয়া আসিলেন (১৭২০ খৃঃ অঃ)। এখন মারাঠীগণ ভারতের প্রায় এক দশমাংশের মূল মালিক ও প্রায় এক তৃতীয়াংশের চৌক-নর্দেশমুখীর অধিকারী। এজন্য বালাজীর স্বার্থে বিপ্লববুদ্ধি ধরচ করিতে হইল; তিনি নূতন নূতন কর্মচারী-দ্বিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া ঔরঙ্গাবাদ, বেরার, বিদর, বিজাপুর, হায়দ্রাবাদ (গোলকুণ্ডা), খান্দেশ—এই ছয়টি স্থান পাঠাইয়া দিলেন। এখন হইতে শিবাজীর বংশধরগণ কেবল ‘সনদ’ করিবার জন্ত নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা শেখ ওয়াশাকের হাতে চলিয়া গেল। ওদিকে দ্বিতীয় শম্ভুজী ও

### বহাদুর

তাহার বংশধরগণ রাজ্য নামে একটা বড় রকমের অধিকার  
হইয়া কোলাপুরে স্বতন্ত্র রহিলেন। ঠিক এই সময় হাঙ্গের  
শাসন-কর্তা চিন্ কুলীচ্, বী নিজাম-উল-মুহু, সৈয়দ-জাহাঙ্গীরের  
কর্তৃত্ব ভুঙ্ক করিয়া, বিদ্রোহের স্বজা উড়াইলেন। তিনি  
নর্মদা পার হইয়া খান্দেশ জয় করিয়া, দাক্ষিণাত্যের দিকে  
অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে কেহ রুদ্ধিতে পারিল না। তিনি  
বলপূরক হোসেন আলিকে সরাইয়া, নিজেই দাক্ষিণাত্যের  
সুবাদার হইয়া পড়িলেন। গোলকুণ্ডা ও দৌলতাবাদের  
বহু অংশ ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া, তিনি অবশেষে নিজাম-  
উল-মুহু আনকড়া নামে দাক্ষিণাত্যের একটি স্বতন্ত্র রাজ্য  
হইয়া উঠিলেন। বর্তমান হায়দ্রাবাদের নিজামগণ ইহারই  
বংশধর।

### দ্বিতীয় পেশওয়ারা—প্রথম বাজীরাও

১৭২০ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিখনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ  
পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশওয়ারা পদে উপবেশন করিলেন। রাজ-  
পদের দ্বার পেশওয়ারা পদও এখন হইতে পুরুষাদ্বয়ক্রমে অধিকৃত  
হইতে লাগিল। পেশওয়ারা বংশে বাজীরাও যে সকলের শ্রেষ্ঠ  
ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শিবাজী যে জাতিকে  
একতা-রূপে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, বাজীরাও সেই জাতির  
মধ্যে শক্তি ও শৃঙ্খলার সঞ্চার করিয়া, ভারতের সর্বত্র  
তাহাদিগকে জরীকপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন।

এই সময় আখব্ব রাও দাবাফে মহারাজার প্রধান সেনাপতি ; তাঁহার সহকারী সেনাপতি হইলেন শীলাজী যারকওয়াড় । দুর্ধানপুরের দুখল সুবাদারকে ক্রমাস্ত পরাজিত করিয়া আরও দুইজন সেনাধ্যক্ষ শেখ ওয়ার মুনজরে পড়িলেন ; ইহাদের নাম মল্‌হরজী হোল্‌কার ও রণজী সিদ্ধিয়া । মল্‌হর ছিলেন এক ধাক্কাড়ের ছেলে ; তাঁহার পিতা আপন বুদ্ধিবলে ‘হোল্’ নামক নিম্ন গ্রামের চৌগলা (অর্থাৎ পাটেলের সহকারী) হইয়াছিলেন । তারপর তিনি রাজা শাহর এক সেনাধ্যক্ষের অধরক্ষক হইয়া ছিলেন । মল্‌হরজী ক্রমশঃ একজন শিল্পীদার হইতে বোড়-সওয়ারদলের মনসবদার হইয়াছিলেন ।

নাতারার পনেরো মাইল পূর্বে কুন্নীরথয়ের নামক গ্রামে সিদ্ধিয়ানের আদিবাস ; ইহারা বাহ্‌মনী মুল্লতানদের সম্বন্ধ হইতে পুরুষানুক্রমে শিল্পীদারি করিয়া আসিতেছিল । রণজী সিদ্ধিয়া ছিলেন বাজীরাওয়ের ব্যক্তিগত পাগাহ্‌ সৈন্তদলের একজন সামান্ত বর্গীর । প্রথমে তিনি বাজীরাওয়ের চটিজুতা বহন করিতেন ; তারপর প্রভুকে দস্তা করিয়া ক্রমশঃ পাগাহ্‌রদের একজন মনসবদার হইয়া উঠিয়াছিলেন । মনসবদার কাজ্‌ছী ভোঁদলেও এই সময় বাজী রাওয়ের নিকট আপন গুণদত্তার বণেষ্ঠ পরিচয় দিয়াছিলেন ।

এই সকল বিবাসী ও রণনিপুণ সেনাপতিদের পার্শ্বে পাইর বাজীরাও রাজা সাহকে বলিলেন, “বিদেশীকে হিন্দুরাজ্য হ’তে উচ্ছেদ করবার এই উপযুক্ত সময় । আদেশ দিন, আমরা শুধু

হৃৎকম্পে প্রাণপণে কুঠারঘাত করি। হৃৎক বরাশায়ী হ'লে  
তার শাখা-প্রশাখাও আপনি ধরে পড়বে।”

সাহ সন্তুষ্ট হইলেন; পেশওয়ারকে বলিলেন, “আপনি  
আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র বটে। হিমালয় পর্বত দেশ  
জয় করে, আপনি মারাঠার বিজয় পতাকা সর্গর্ষে উড়িয়ে  
দিলে। আমার কোন আপত্তি নাই।”

বাজীরাও ক্রমাগত পনেরো বৎসরকাল ভারতের বিভিন্ন  
অংশে মুঘল ও তাহার মিত্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।  
তিনি আদেশ পুনরধিকার ও মালব বিজয় করিয়া চৌধ ও  
সর্দেশমুখী কর আদায় করিয়াছিলেন। মালবের কর আদায়ের  
তার বেওয়া হইরাছিল মল্লের রাও হোল্কার ও রণজী  
সিঙ্ঘিয়ার উপর।

নিজাম-উল-মুক্ক আসফ্জা তখন মুঘলদের কাবু করিয়া,  
গোলকুণ্ডা রাজ্যের খানকটা গ্রাস করিয়াছেন। তিনি  
মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ঐ অংশের চৌধ ও সর্দেশমুখী দিতে চাহিলেন  
না। ইহার ফলে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হন  
এবং বাজীরাওয়ের লিখিত সন্ধির খণ্ডার সহি করিতে বাধ্য  
হন।

গুজরাটের শাসন-কর্তা শুর বুলন্দ খাঁ, বাজীরাওয়ের  
সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, সুরাট বন্দর বাবে সমগ্র দেশের  
চৌধ ও সর্দেশমুখীর আদায়ের অধিকার মহারাষ্ট্রদিসকে ছাড়িয়া  
দিলেন। গুজরাটের কর আদায় করিবার জন্য সেনাপতি

দ্রাবক রাও ধার্বাড়ের উপর সারিহ অর্পণ করা হইল; এবং তাঁহাকে সাহাব্য করিবার জন্ত পিলাজী গারকওয়ার্ড ও কাঙ্ক্ষী কবর আনুত হইলেন। কিন্তু নিজাম-উল-মুকের সহিত হস্তাক্ষর করিয়া; সেনাপতি তাঁহার দলবল সহ বিদ্রোহ করিলেন। বালাজী তৎক্ষণাৎ এই বিদ্রোহ-দমনে কৃতকার্য হইলেন। দ্রাবক রাও যুদ্ধে প্রাণ নিলেন।

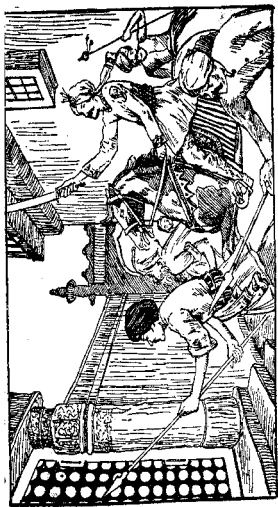
কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি পেশওয়ারা বিদ্রোহীদের কোন শাস্তি দিলেন না। বরং দ্রাবকের নাবালক পুত্র যশোবন্ত রাও ধার্বাড়কে গুজরাটের শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ভার হাড়িয়া দিলেন; তাঁহাকে সাহাব্য করিবার জন্ত পিলাজী গারকওয়ার্ড 'সেনা ধানু খেয়াল' উপাধি পাইয়া পূর্বপদে বাহাল হইলেন। কথা থাকিল, সমস্ত রাজস্ব আদায় করিয়া, অর্ধেক পেশওয়ারকে পাঠাইয়া দিতে হইবে; বাকী অর্ধেক তাঁহার খুশীমত খরচ করিবার স্বাধীনতা পাইলেন। কিছুদিন পরে আহমেদাবাদের সুবাদার অভি সিংহ পিলাজীকে হত্যা করিয়া, বরোদা-দুর্গ দখল করিলে, তাঁহার জাতা মাধোজী গারকওয়ার্ড ও পুত্র চুন্নাভী গারকওয়ার্ড একদল সৈন্য লইয়া সমগ্র বরোদা জেলা ত দখল করিলেনই, তা' ছাড়া জম্মুশহর, আহমেদাবাদ প্রভৃতি পদানত করিয়া ও রাজপুতানার কিছু দূর পর্য্যন্ত দখল করিয়া, যারাঠা-বীর্ঘোর পরিচয় দিয়া আসিলেন।

কাঙ্ক্ষী তৌন্সেকে পেশওয়ারা বাকীরাও বেরোরের সুবেদার ও সেনাপতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অব্যাহতা প্রকাশ

করায়, তাঁহাকে বন্দী করিয়া, তাঁহার জাইপো রঘুজী  
কৌসল্যকে বোম্বের শাসন-কর্তা-পদে নিযুক্ত করা হইল।  
মাহার এক স্ত্রালিকার সহিত রঘুজীর বিবাহ হইয়াছিল।  
পেশ্‌ওয়ার নিকট রঘুজী এই একদার করিয়া গেলেন যে, তিনি  
সাত্তারা সরকারে আদালতী রাজস্বের অর্ধেক নিম্নমিত পাঠাইয়া  
দিবেন, তাহা ছাড়া বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা পৃথক কর  
দিবেন।

শিবাজী জিজ্ঞাসার সিদ্ধী মুলতানদিগকে বশে আনিতে  
পারেন নাই। কিন্তু পেশ্‌ওয়ার রাজ্যের কোশলে জিজ্ঞাসী অবরুদ্ধ  
হইয়া, তাঁহার নিকট মাথা নত করিল। সিদ্ধীরা সন্ধিবলে এগারটি  
মহলের বাৎসরিক অর্ধেক রাজস্ব দাবী এবং তাঁলা, উচিত-  
গড়, গোশালা প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ মহারাষ্ট্রীদের হাতে ছাড়িয়া  
দিলেন। ইহার পর মারাঠারা বোম্বাই নগরের নিকটস্থ থানা,  
মলসিট ও বেসিন দ্বীপ হইতে পার্শ্ব সীমাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন।  
আরব্য উপসাগরে মহারাষ্ট্রদের উৎপাত সমান ভাবেই  
চলিতেছিল। ইহাদের হাতে ইংরাজদের জাহাজ প্রায়ই ধরা  
পড়িত। ইংরাজরা তখন মারাঠা জলনন্দ্যুর নামে সত্যই  
ধরহরি কাঁপিতেন।

নানা দিক জয় করিবার জন্য পেশ্‌ওয়ারকে এক বিরাট  
বাহিনী পুৰিতে হইয়াছিল। সেক্ষত্ৰ রাজ্যের ধরত অন্ত্যস্ত  
বাড়িয়া গিয়াছিল; পেশ্‌ওয়ার ব্যক্তিগতভাবেও ঋণগ্রস্ত হইয়া  
পড়িয়াছিলেন। তিনি মলহর রাও হোলকারকে বড়ন বড়ন রাজ্য



মল্লহর রাত্তি হোজুকোর...রাক্ষসানী নির্দীপ ডোলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

[ অধ্যায়-১৫০ পৃষ্ঠা ]





আক্রমণ করিয়া চৌধ ও সর্দৈশমুখী কর আদায় করিতে আদেশ দিলেন। মল্লহরবাও দুর্গদ্বর সেনাপতি ; যেমন সাহসী, তেমনি প্রভুভক্ত। তিনি উত্তর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পুরাণুরি ঘোরালিরার জয় করিলেন এবং আগ্রা অধিকার করিয়া, রাজধানী দিল্লীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট মুহাম্মদ শাহ ও তাঁহার উজীর খাঁ দোরান্ মল্লহর রাওকে বাধা দিবার স্বীকৃতি করিয়া অবশেষে মসৌবের উপর হাল্ ছাড়িয়া দিলেন। হোল্কার দুইহাতে রাজধানীর ধনরত্ন লুটিয়া, সুবাদার ও ফৌজদারদের নিকট হইতে চৌধ ও সর্দৈশমুখীর প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া, মালবের দিকে কিরিয়া আসিলেন। ইতঃপূর্বে পেশওয়া মুঘলদের হাত হইতে বৃন্দেলখণ্ড জয় করিয়াছিলেন এবং তৎকাল রাজপুত রাজাকে ফিরাইরা দিয়া, প্রকাণ্ড বাজী জেলা এনাম পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বাজীতে একটি ছোটখাটো মহারাষ্ট্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পর ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও নিজেই দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে মল্লহর রাও হোল্কার ও ব্রজী সিদ্ধিহাকে সঙ্গে লইয়া চম্বল (যমুনা) নদী পার হইলেন। কয়েকটি যুদ্ধ ঘূড়ের পর দিল্লীর মুঘল সেনাপতিরা হারিয়া গেলেন। মুহাম্মদ শাহ তখন নিজাম-উল-মুল্কে মালওয়া ও গুজরাটের শাসন-ভার দিবার লোভ দেখাইয়া, বাজীরাওকে বিরুদ্ধে দৃঢ় করিতে তাঁহাকে গোপনে আহ্বান করিলেন।

নিজাম-উল-মুল্কের প্রকাণ্ড সৈন্যদলের সহিত, দিল্লীর একদল

রাজ্য অধিকারের অধীনে রাজপুতানার একদল সৈন্য বোম্বাই  
বিদ্য এক বুন্দেলখণ্ডের রাজাদেরও একদল সৈন্য বোম্বাই বিদ্য;  
শত্রু সৈন্যের সংখ্যা লক্ষ থাকেন হইবে। বাজীরাজ প্রায়  
আশী হাজার সৈন্য তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত করিলেন।  
ইন্দ্রামণ্ড ও জুপালের নিকট প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইল (১৭৬৮ খ্রি  
অঃ)। নিজাম-উল-মুক্ত হারিয়া গেলেন এবং মারাঠারা  
তাঁহার হস্তভঙ্গ সৈন্যদল ঘেরিয়া সংহারলীলা সূত্র করিয়া দিল।  
নিরুপায় হইয়া নিজাম শেষে স্বীকার করিলেন যে, দিল্লী-সম্রাটের  
নিকট হইতে নর্থানা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র মধ্যভারতের  
রাজত্ব করিবার সনদ ও ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের খরচ পেশ্‌ওয়ারকে  
আঁকার করিয়া দিবেন।

ইহার পর বেরারের মারাঠী রাজ-প্রতিনিধি রঘুজী  
ভোঁসলের এক কাকা রঘুজী ভোঁসলে একদল মারাঠী সৈন্য  
লইয়া, অমরাবতী হইতে বাহির হইয়া, পূর্বাধিকে নাগপুর, সোন-  
পুর, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া, কটক পর্য্যন্ত লুণ্ঠন  
করিলেন। রঘুজী নিজের উত্তরে অগ্রসর হইয়া, ভুসলপুর ও  
বুন্দেলখণ্ড অগ্ৰসর করিয়া, এলাহাবাদ পর্য্যন্ত স্থান লুণ্ঠন করিয়া  
বহু ধনরত্ন লুটিয়া আনিলেন। এই সকল ব্যাপারে ভোঁসলদ্বারা  
পেশ্‌ওয়ার অসুখান্ধি লব্ধ নাই বলিয়া, বাজীরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ  
হইয়াছিলেন।

ইহার পর পারস্য হইতে নাদির শাহ, আনিয়া পঞ্জাবের  
কতকাংশ ও দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া, রাজধানীর অধিবাসীদিগকে

কছুকাটা করিলেন। বিজয়ী সারি কখন কিরিয় গেলেন, তখন কুৎসবের সেরদার একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। সমস্ত ভারকে মহারাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার এমন চমৎকার সুযোগ বোধ হয় আর আসে নাই। বাজীরাও তাহারই বিরূপ উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মৃত্যু ঘটিল ( ১৭৬০ খ্রঃ অবঃ )।

## তৃতীয় পেশ্‌ওয়ার-বালাজী বাজীরাও (নানা সাহেব)

বগুজী ভৌসলের ইচ্ছা ছিল—বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তিনি পেশ্‌ওয়ার পদ অধিকার করিবেন; কিন্তু বৃদ্ধ রাজা সাহেব বাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী বাজীরাওকে পেশ্‌ওয়ার করেন। বগুজী ভৌসলে ইহাতে বেশ একটু ক্ষুব্ধ হইলেন। কিছু দিন পরে তিনি তাঁহার দেওয়ান, ডাক্তর পদ্মকে বেহার শাসনের ভার দিয়া, সুরদুর কর্ণাট-বিজয়ে চলিয়া গেলেন। এই সময় আলিবর্দি খাঁ বাজলা, বিহার ও ওড়িষ্যার নবাব। তিনি প্রথমে ছিলেন বিহারে সহকারী শাসন-কর্তা; তারপর নবাব সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়া ও ওড়িষ্যার সহকারী শাসন-কর্তা মুর্শীদ কুলীকে পরাজিত করিয়া, নবাবি তত্ত্ব অধিকার করেন।

যীর হবিব ছিলেন মুর্শীদ কুলীর দেওয়ান; তিনি ডাক্তর পদ্মকে বঙ্গ-বিহার-ওড়িষ্যা লুটপাট করিতে গোপনে আমন্ত্রণ করিলেন।

ভাস্কর দেওদান্ ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়—প্রকাণ্ড বোজা ; তখন মহারাষ্ট্রের চারি বর্ষের ঐত্যোকেই লড়াইয়ে পরিপক ! তিনি বারো হাজার বর্গীর অর্থাৎ অধ্যারোহী সৈন্য লইয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রায়গড়, পচেংগড় প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া, মহারাষ্ট্রীরা বাঙ্গলার দিকে আসিতে লাগিল। মীর হবিব ভাস্করের মলে যোগ দিলেন। আলিবর্দি মারাঠার এই বস্তার স্রোত রুদ্ধ করিতে আসিয়া ছটয়া গেলেন। ভাস্কর পশ্চিম হুগলী অধিকার করিলেন, চন্দননগর লুট করিলেন, কাটোয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত স্থান স্বশান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মারাঠারা হিন্দু-মুসলমান বিচার করিল না—বালক রুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ভেদ করিল না, যাহাকেই পাইল তাহাকেই হত্যা করিল।

বর্ষার শেষে মুর্শাদাবাদ হইতে বহু সৈন্য লইয়া, নবাব আলিবর্দি বর্গীদের তাড়া করিলেন। মারাঠারা সম্মুখ যুদ্ধে ধরা না দিয়া বালেশ্বরের দিকে পলায়ন করিল ; সেখান হইতে ছোট নাগপুর, ছোটনাগপুর হইতে বিহার, বিহার হইতে মেদিনীপুর অগ্নি করিয়া ছুটাছুটি করিয়া আলিবর্দির দুর্দশার সীমা রহিল না। ইতোমধ্যে রঘুজী বেরারে ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৪৪ সালে তিনি বিশ হাজার বর্গীর সৈন্য ভাস্কর পশ্চের অধীনে দিয়া, ওড়িষ্যায় পাঠাইয়া দিলেন। আলিবর্দি ছুটিতে ছুটিতে ওড়িষ্যায় আসিলেন ; কিন্তু ভাস্করের হাতে তাঁহাকে রৌতিমত নাহেহাল হইতে হইল। অবশেষে সন্ধির প্রার্থনা করিয়া আলিবর্দি, ভাস্কর ও তাঁহার বাইন জন

প্রধান অনুচরকে শিবিরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং নিতান্ত নৃশংসভাবে হত্যা করাইলেন।

পর বৎসর রঘুজী ভৌঁস্লে নিজে বাঙ্গলার আসিলেন এবং ভাস্কর-হত্যার প্রতিশোধ লইতে বাঙ্গলা দেশের পশ্চিমভাগে অকথা অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ওড়িয়া মারাঠারা পুরাপুরি অধিকার করিয়া, মেদিনীপুরের চারদিক লুণ্ঠপাট করিতে লাগিল। মীর হবিব রঘুজীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি একদল বর্গী সৈন্য লইয়া কলিকাতার নিকট বানা দুর্গ অধিকার করিলেন\*। এই সময়ই ‘মহারাষ্ট্র ডিচ্’ (খাল) তৈয়ারী হয়। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই সময়ই ‘ছেলে ঘুমালো পাড়া ছুড়ালো বর্গী এল দেশে’... ইত্যাদি ঘুম-পাড়ানী ছড়ার উৎপত্তি হয়। তারপর বর্গীরা আলিবর্দীর সঙ্গে গরীলা-যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কাতর, অবসন্ন করিয়া তুলিল। কখনও কখনও মহারাষ্ট্ররা হারিতে লাগিল বটে, কিন্তু সে পরাজয়ে তাহাদের উৎসাহ হ্রাসও ভেঙ্গে ছিলনা উঠিল। বর্গীরা বাঙ্গলার চতুর্দিকে ভীষণভাবে লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিল। অবশেষে নবাব আলিবর্দী রঘুজী ভৌঁস্লেকে ওড়িয়া ছাড়িয়া দিতে ও বারো লক্ষ টাকা বাৎসরিক চৌধ দিতে সম্মত হইলেন।

\* “বর্গীরা হাওয়া”—অধ্যাপক সার হুসেন সরকার।

(প্রবাসী, আবার, ১৩৩৮)

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে শাহর দখল হয়। শাহর জেলে ছিল না বলিয়া তিনি কতে সিং ভৌসলকে পোষ্য গ্রহণ করেন। তাঁহাকে পৈত্রিক জায়গীর ও শাহর নিজস্ব সম্পত্তিতে বাহাল করিয়া, 'আকালকোটের রাজা' বলিয়া স্বীকার করা হইল। তার-পর দ্বিতীয় শিবাजीর পুত্র রায় রাজাকে মহারাষ্ট্রের জায়গীরদার রাজা রূপে সাতারার সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু রাজার সমস্ত সম্বল ও অষ্ট প্রধানদিগকে লইয়া পেশওয়া বালাজী পুয়ার চলিয়া আসিলেন। তদবধি পুনা মহারাষ্ট্রের সত্যকার রাজধানী হইল। কোলাপুর, আকালকোট ও সাতারার ভিন্নস্বয় নামমাত্র রাজা কোনমতে টিকিয়া রহিলেন।

বালাজীস সমস্ত ধাবাড়ের বংশধর যশোবন্ত গুজরাটের পশ্চিমভাগ, জয়পুৰ পার্শ্বভাগে গুজরাটের পূর্বভাগ (বরোদা ও আহমেদাবাদ সমেত), সমগ্র মধ্যভারতের উত্তরার্দ্ধ রণজী সিংহিয়া, দক্ষিণার্দ্ধ মলহর রাও হোলকার এবং বেরার, নাপপুর, ছোট নাপপুর ও ওড়িয়া রম্ভাজী ভৌসলে—পেশওয়ার নামে শাসন করিতেছিলেন। বাশ্ মহারাষ্ট্র দেশ ছাড়া কর্ণাটের কতকাংশেও পেশওয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পারস্ত-সম্রাট নাদির শাহের দখল-পর, তাঁহার অধীন এক দুর্ভাগ্য আফগান সর্দার পারস্যের অনেকটা দখল করিয়া আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিমস্থ হীরাট নগরে স্বাধীন রাজা হইয়া বসিলেন। ইহার নাম আহম্মদ শাহ দুর্ভাগী। তারপর সমগ্র আফগানিস্থানকে আরও স্বাধীন করিয়া তিনি পঞ্জাব আক্রমণ

করেন এবং পঞ্জাবে এক শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়া, রীক্ষিত-  
 স্বাধীনতা আদায় করিতে থাকেন। দুই বৎসর পরে তিনি  
 পঞ্জাব পার হইয়া আসিয়া, কয়েক মান ধরিয়া দিল্লী  
 ও মথুরা যাত্রী লুণ্ঠন করেন এবং নারিনশাহর মত বৌদ্ধ-  
 হস্তাকারে অন্বেষণ করেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলম-  
 গীরের তখন ভ্রমশা; তিনি মুখ বুজিয়া এক পর মারাঠার,  
 একবার বিশেষ দস্তারদারের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে  
 পারিলেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশওয়ার জাতা রঘুনাথ রাও (জাক নাম  
 'রাঘোবা') পঞ্জাবে গিয়া, আহম্মদ শাহ ছরাদির প্রতিনিধিকে  
 তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত পঞ্জাবের মালিক হইয়া পড়িলেন। এ  
 সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় তিন চতুর্থাংশ মারাঠাদের হাতের  
 মুঠার মধ্যে। আর এক চতুর্থাংশ হস্তগত করিতেও বোম-  
 বয় তাঁহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু এমন কতক-  
 গুলি কারণ আসিয়া জুটিল, যাহাতে মারাঠাদের অনুষ্ঠানকে  
 বিপরীত দিকে ঘুরিয়া গেল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ  
 পঞ্জাবের বেশীর ভাগ পুনরুদ্ধার করিলেন; কিন্তু মারাঠা ও  
 পঞ্জাবীরা তাঁহার নৈস্কল্যে পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিয়া,  
 তাঁহাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিল।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বহু নহর নৈস্ক লইয়া আহম্মদ শাহ  
 ছরাদী মারাঠাদের দৰ্প চূর্ণ করিতে আসিলেন। মারাঠারাও  
 চতুর্দিক হইতে প্রায় দুইলাখ নৈস্ক বোম্বাড করিয়া



পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র করিতে পারিল। পেশওয়ার জয় হইয়াছে এই যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করিতে অধীকার করিলেন; কাজেই বালাজীর আঠারো হাজারের পুত্র বিশ্বাস রাওকে এই বিশাল বোদ্ধদলের সেনাপতি হইতে হইল। অমাত্য সদাশিব রাও ভাও, বিশ্বাসরাওয়ের পরামর্শদাতা ও সহকারী হইয়া রহিলেন। কিন্তু সামরিক বিষয়ে পরামর্শ দিবার বা সৈন্ত-চালনা করিবার অভিজ্ঞতা সদাশিবের কিছুই ছিল না।

পানিপথে যাইবার পথে মারাঠা সৈন্তগণ দিল্লী অধিকার করিয়া কিছু সময় ও শক্তি নষ্ট করিয়া গেল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের নব্বৈ আশ্বিনারী ভোরে আহম্মদ শাহ্ দুর্রানীর সহিত সংগ্রাম বাধিল। বর্গীর অম্বারোহীণ দুর্রানীর কাবুলি সৈন্তদিগকে, ক্রমাগত ছরৎট। কাল অন্তত বীরশ্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রীতিমত কাবু করিয়া ফেলিল। এদিকে মারাঠাদের শিবিরে একশতাব্দি সৈন্তের খাদ্য ও জলের অভাব হইল। বিশ্বাসরাও কুখ্যাত বর্গীরদিগকে শিবিরে ফিরাইয়া আনিয়া, পহাড়িক সৈন্তদিগকে আশ্রয়িতা লইয়া চলিলেন। এমন সময় আহম্মদ একদল নুতন সৈন্ত লইয়া প্রবল বেগে মারাঠাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দুই ঘণ্টা কাল ধোরতর যুদ্ধের পর কেহ কাহাকেও হঠাইতে পারিল না।

বৈকাল বেলা বিশ্বাস হঠাৎ সাংঘাতিক অ্যুহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। মারাঠারা উৎসাহবাদী হইল। সদাশিব ভাওয়াদিগকে সম্মুখ দিকে চালনা করিতে চেষ্টা করিলেন;

কিছু সৈন্যগণ উলবৃত্ত নেতার অভাবে পিছনে হঠিতে লাগিল। বর্ষার সৈন্যগণ তখন শিবিরে ছিল, তাহারা বিখ্যাসরাওরের যুদ্ধ-সংবাদ শুনিয়া আগেভাগেই ছোড়া ছুটাইয়া পলাইতে লাগিল। এরিকে দুর্গাশী তিনদিক হইতে মারাঠী পদাতিক-গণকে ঘেরিয়া, হত্যার বিভীষিকা লাগাইয়া দিলেন। বোলো মাইল পর্যন্ত তাহারা মারাঠাদিগকে মারিতে মারিতে হঠাইয়া আনিয়া, ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। বিখ্যাসও, সদাশিব এবং সাতাশ জন সেনাপতি এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। সাধারণ সৈন্তের যত্ন সংখ্যা অন্ততঃ লাখ খানেক হইবে।

তৃতীয় পাণিপথের এই যুদ্ধই মহারাষ্ট্রদের মেরুদণ্ড ভঙ্গের মত ভাবিয়া দিল। বৃদ্ধ মলহর রাও হোলকার যুদ্ধের গোড়াতেই আপন সৈন্য লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বহি যুদ্ধে সর্কান্তকরণে যোগ দিতেন ও রাঘোবা নিজে সৈন্য-পরিচালন করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় মারাঠাদের এমন পরাজয়ের কালিমা সর্কাজে লেপন করিতে হইত না। তদুপরি উত্তর-ভারত-প্রবাসী রোহিলাগণ ও অযোধ্যার নবাব মুজাউদৌল্লা, আহম্মদ শাহকে সাহায্য না করিলে, বোধ হয় ইতিহাসের ধারা এমন ভাবে বদলাইয়া বাইত না। বাহা হউক, ইহার ফলে সমগ্র ভারতে মারাঠার রাজত্ব-বিস্তারের আশা নিম্নূল হইল। মুঘল ও মারাঠার এই দুর্বলতার সুযোগে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এক তৃতীয় শক্তি ভারতের-নাট্যমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিল ;—সে ইংরাজ।

## পঞ্চম অধ্যায়

### জীবন-সঙ্কায়

#### জুজু পেশ ওয়া-মাধবরাও

পাণিপথের যুদ্ধের ছয় মাস পরেই পেশ্‌ওয়া বালাজী তৎক্ষণদয়ে মৃত্যু-বরণ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সতেরো বৎসর বয়স্ক মাধবরাও এই শোকাচ্ছন্ন জাতির নায়ক নির্বাচিত হইলেন।

ইতঃপূর্বে নিজাম-উল-মুক্তের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র নাজির জঙ্গের সহিত মারাঠাদের সন্ধির ফলে বিজাপুরের অনেকাংশ তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে। কাজেই নিজাম-রাজ্য বেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে। ইতঃপূর্বে কর্ণাটের মধ্যস্থলে মহীশূরে একজন হিন্দু রাজা একটি মাঝারী গোছের রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; হায়দার আলি নামে মহীশূরের এক মুসলমান কর্মচারী তাঁহার হিন্দুপ্রভুকে তাড়াইয়া দিয়া, নিজেই সুলতান হইয়া বসিয়াছেন। তাহা ছাড়া পূর্ব-কর্ণাটে আকট নামক স্থানকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি ছোট মুসলমান রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল মুসলমান রাজ্যের কর্তৃত্ব লইয়া ফরাসী ও ইংরাজ বণিকদলে রীতিমত টকর লাগিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, ইংরাজ বণিকদের রাজ্যের লোভ বেশ বাড়িয়া

গিয়াছে। দূর হইতে মহারাষ্ট্র দেশের উপরও তাঁহার। সতৃষ্ণ  
নয়নে তাকাইতেছেন। পশ্চিম-গুজরাট ধাবাড়ের হস্তচ্যুত  
হইয়াছে; এখন কেবল বরোদার গায়কওয়াড়, গোরালিম্বরে  
সিদ্ধিরা, ইন্দোরে হোলকার ও মধ্যপ্রদেশে সিদ্ধিয়ার বংশ  
পুরুষানুক্রমে পেশওয়ার প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার।ও  
পেশওয়ারকে রীতিমত কর দেন্ না, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন  
করেন না, নিজেরদের মধ্যে প্রাধান্ত লইয়া সর্বদা কণ্ঠা-কাঁটি  
করিতেছেন।

বালক মাধব রাও এই দুর্দিনে যে ভাবে জাতির মধ্যে  
উৎসাহ ও ঐক্য আনিবার চেষ্টা করিলেন, তাহা সত্যি প্রশংসার  
যোগ্য। তাঁহার কাকা রাঘোবা তাঁহাকে হাতের পুতুল করিয়া  
নিজেই সমস্ত ক্রমতা আত্মসাৎ করিতে চাহিতেন, তিনি  
তাহা নিবারণ করিলেন। হায়দার আলি মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ  
অধিকার করিবার চেষ্টা করায়, তিনি দুই-দুইবার তাঁহাকে ভীষণ-  
ভাবে পরাজিত করিয়া, ৩২ লক্ষ টাকা খেদারং আদায়  
করিলেন। মাধবরাও ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে ও রাজপুতানায়  
একদল প্রকাণ্ড মারাঠা সৈন্য পাঠাইয়া, বহু জাঁও রাজপুত জেলা  
হইতে কর আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন। তারপর মারাঠাগণ  
বিদ্রোহী অধিকার করিয়া, সাহ আলমকে নিংহাননে বন্দি করিয়া এবং  
সৈয়দ আব্দুল হকের মতো তাঁহাকে কথায় কথায় ওঠ-ব'স করাইতে  
লাগিল। ইহার পর পাণিপথে শত্রুতাচরণের শোধ তুলিতে,  
তাঁহার। ঘোগরা নদী পার হইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিল।

রোহিলারা লক্ষ লক্ষ টাকা চৌধ দিরাও মারাঠার নির্ধম  
অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল না। অতঃপর মারাঠারা অযোধ্যার  
নবাবের রাজ্য হার, হার দিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়  
মাধব রাওয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাইরা তাহার। বিব্রটিতে দেশে  
ফিরিয়া আসিল।

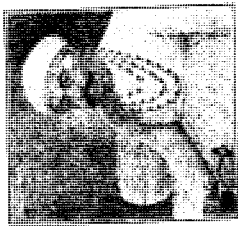
পেশ্‌ওয়া-নান্নান্নাও

মহা পেশ্‌ওয়া-মহান্নাও নান্নান্নাও

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মাধবের মৃত্যুর পর তাঁহার আঠারো  
বৎসরের ভাই নারায়ণ রাও পেশওয়ার পদে বসিলেন। কিছু  
দিনের মধ্যেই ক্ষমতালোভী রঘুনাথ বা রাঘোবা তাঁহাকে বড়দল  
করিয়া হত্যা করাইলেন এবং নিজেকে পেশ্‌ওয়া বলিয়া রটনা  
করিলেন। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের বিধবা পত্নী এই সময় এক পুত্র  
প্রসব করায়, অমাত্যগণ এই শিশুকেই প্রকৃত পেশ্‌ওয়া বলিয়া  
প্রচার করিলেন। দুইটি দল হইয়া গেল; একদল নারায়ণের  
শিশুপুত্র মধুরাওয়ের পক্ষে, অন্যদল রাঘোবার পক্ষে। কিন্তু  
রাঘোবার দল অত্যন্ত পাংলা হওয়ার, তিনি ইংরাজদের সাহায্য  
চাহিতে সুরাটের দিকে চলিয়া গেলেন। নানা ফড়নবীশ নামক  
একজন সহকারী-অমাত্য, শিশু মধুরাও নারায়ণকে নিংহাসনে  
বসাইয়া, তাঁহার নামে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। নানা  
ফড়নবীশ ছিলেন ঘোর ইংরাজ-বিরোধী, অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন  
ও শিক্ষিত রাজনৈতিক।



মান্না কাশ্যবীন



মাদোজী সিজিয়া



এদিকে রঘুনাথ রাও সুরাটে আসিয়া, ইংরাজদের সহিত এক সন্ধি করিলেন। সন্ধির শর্ত হইল—ইংরাজগণ রঘুনাথকে পেশ্‌ওয়া পদে বসাইতে সাহায্য করিবেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার বেসিন বন্দর, সলুসিট ও বোম্বাইয়ের চারিদিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পাইবেন। গায়কওয়াড়, রঘুনাথের পক্ষ লইলেন; সিদ্ধিয়া ও হোলকারীরা মধুরাওরের পক্ষ লইলেন। দুইদলে মারামারি বাধিয়া উঠিল। এমন সময় একদল ইংরাজ সৈন্য রাঘোবাকে লইয়া পুনর দিকে অগ্রসর হইল। পুনর ত্তেরো মাইল দূরে ওয়ার্‌গীওয়ে মারাঠাগণ যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্যকে ভীষণভাবে হারাইয়া দিল। অবশেষে তাহার মাথা হেঁট করিয়া নানা ফড়নবীণের সঙ্গে এক সন্ধি করিল। সন্ধির শর্ত রহিল যে, ইংরাজরা রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন এবং মহারাষ্ট্রের দ্বীপগুলি ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু বৃটিশ সৈন্য বোম্বাইয়ে ফিরিয়া গিয়া, এই সন্ধির শর্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং নূতন করিয়া যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বুন্দেলখণ্ড হইতে জেনারেল গডার্ড এক প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া সুরাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। গায়কওয়াড়ের সহিত ইংরাজের এক পারস্পরিক মিত্রতানুচক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। গায়কওয়াড় ও ইংরাজের মিলিত সৈন্যদল আহমদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিয়া, পুনর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। নানা ফড়নবীণের দল ইংরাজদিগের উপর ভীম



আক্রোশে পতিত হইয়া, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। ইংরাজ পক্ষের প্রায় ৫০০ সেনা হত হইল; কয়কটি কামান ও বহু রসদ মারহাটার লুটিল।

ওদিকে পপ্‌হাম নামক আর একজন ইংরাজ সেনানায়ক হঠাৎ পোরালির আক্রমণ করিয়া, রাজধানীর ত্ত্বেস্ত দুর্গটি বহু কষ্টে হস্তগত করিলেন। মাধবজী (মাধোজী) সিদ্ধিয়া তখন বাধ্য হইয়া ইংরাজদের সহিত একটি পৃথক সন্ধি করিলেন।

উভয় পক্ষের এই হারজিতের পর সালুবাই নামক স্থানে এক সন্ধি হইল। সন্ধির কলে ইংরাজগণ মহারাত্রীদের সমস্ত স্থান ফিরাইয়া দিলেন এবং বাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন : রাখোবা তিন লক্ষ টাকা করিয়া বাৎসরিক বৃত্তি পাইবেন—স্থির হইল।

মাধবজী সিদ্ধিয়া ইংরাজদের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া আবার নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি দিল্লীর বাদশা শাহ আলমকে হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া, স্বয়ং তাঁহার সেনাপতি হইলেন এবং পেশওয়ার জন্য উজ্জীৱী সনন্দ আদায় করিয়া লইলেন। সিদ্ধিয়ার চেষ্ঠায়ই পুনায় একজন ইংরাজ দূত রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে সিদ্ধিয়ার ত্রিশ হাজার সৈন্য ইউরোপীয় যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। সিদ্ধিয়া ইন্মোর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং রাজপুত শক্তিকেও বখেটে ধ্বংস করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। এই সময় মল্‌হররাও হোলকারের

বিধবা পুত্রবধূ পুত্রাবতী অহল্যাবতী বিশেষ বোধ্যতার সহিত ইন্দোর শাসন করিতেছিলেন। সিদ্ধিয়ার এত অমত্যবধি বেশিরা ইংরাজরা ভীত হইয়া পড়িলেন। বাহা ইউক, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মাধবজীর মৃত্যুতে ইংরাজরা অনেকটা হাঁফ, ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এনিকে পুনর নানা কড়নবীশ, মধুরাও নারায়ণের অভিজ্ঞতাবক্রমে, বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজরা একদল সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, কড়নবীশ পুনর তাহা অগ্রাহ করেন। তারপর মহীশূরের কমতাশালী মুলতার টিপুৰ বিরুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন যুদ্ধবাত্রা করেন, তখন নানা কড়নবীশ একদল মারাঠা সৈন্য তাঁহার সাহায্যে পাঠাইয়া দিলেন। টিপুৰ রাজ্য কাড়িয়া লইয়া, ইংরাজগণ উহার এক তৃতীয়াংশ মারাঠাদিগকে প্রদান করিলেন।

ইহার পর নানা কড়নবীশ, সিদ্ধিয়ার ও হোল্কার রাজ্যের সাহায্য লইয়া, নিজাম-রাজ্য আক্রমণ করেন। নিজাম ইংরাজদের মিত্র ছিলেন; বিপদে পড়িয়া তিনি ইংরাজের পুনঃ পুনঃ সাহায্য চাহিয়াও পাইলেন না। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নিজাম মাদহাঠীসের হাতে গুরুতররূপে হারিয়া গিয়া, প্রকারান্তে তাহাদের স্ত্রীবেদার হইয়া রহিলেন।

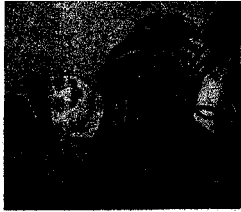
নানা কড়নবীশের কঠোর শাসনে মহারাষ্ট্রের বাহিরে নৌরব বার্কিস ও ভিতরে শৃঙ্খলা আসিল। কিন্তু পেশওয়া মধুরাও নারায়ণ বৌদন বয়সেও নানা কড়নবীশের বেদার পুতুল হইয়া থাকা অসহ্য ঘোষণা করিলেন। একদিন কড়নবীশ মধুরাওকে

ব্যয়-পর-নাই ভিন্নকার করার; মনের দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করিলেন। ইহাতে নানা কড়নবীশের শোক-দুঃখের আর অবধি রহিল না; সত্যই তিনি পেশ্‌ওয়ারকে পুত্রের দ্বায় ঘেঁষ করিতেন।

### সপ্তম পেশ্‌ওয়ার—দ্বিতীয় বাজীরাত

ইহার পর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের পুত্র ( দ্বিতীয় ) বাজীরাত বাজীরাত পেশ্‌ওয়ার পদ লাভ করিলেন; নানা কড়নবীশ প্রথমটা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি দ্বিতীয় বাজীরাতের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানার মৃত্যু হইল। ইহার পর মারাঠার নৌভাগ্য-রবি ক্রান্ত অস্তাচলগামী হইল।

দ্বিতীয় বাজীরাত অনেকটা ‘বাপ্‌কা বেটা’ বটেন; তাঁহার মত অপদার্থ কাপুরুষ পেশ্‌ওয়ার মহারাজের মাটিতে আর জন্ম-গ্রহণ করে নাই। এই সময় মহারাষ্ট্রে ভীষণ অরাজকতা দেখা দিল। দুর্বুদ্ধি দ্বিতীয় বাজীরাত যশোবন্ত রাও হোল্‌কারের আতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায়, যশোবন্ত রাও ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যে পুণা অধিকার করিলেন; পেশ্‌ওয়ার তাঁহাকে বাধা দিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। যশোবন্ত নিজের খুশীমত বাজীর হোটে ভাই অন্নতরাওকে পেশ্‌ওয়ার আসনে বসাইয়া দিলেন। বাজীরাত হোল্‌কারের ভয়ে পলাইয়া মিরা ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন। বেসিনে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার এক



নানা মাছের ।



কাকী ও মাকী লক্ষ্মীবাড়ি ।

[ অষ্টম পৃষ্ঠা ]



হীন সন্ধি হইল। সন্ধির সৰ্ত্ত রহিল এইরূপ যে, বাজীরাও পেশওয়ারা পক্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংরাজের অধীন একজন মিত্র বলিয়া গণ্য হইবেন; পুনায় তিনি একমল ব্রিটিশ সৈন্য পোষণ করিবেন এবং এই সৈন্যের ভরণ-পোষণের জন্য ২৬ লক্ষ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি ইংরাজদের নিকট গচ্ছিত রাখিবেন।

একমল ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য পাইয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পুনায় ফিরিয়া আবার নিজের গদীতে বসিলেন। কিন্তু সিদ্ধিয়া, হোল্কার প্রভৃতি অসন্তুষ্ট মারাঠা নায়কেরা পেশওয়ার এই হীনতার ব্যথেষ্টে অপমান বোধ করিলেন; এবং বেনিনের সন্ধিপত্রের সৰ্ত্ত তাঁহাদিগকে মানিয়া চলিতে বলা হইলে, তাঁহারা একই সময়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরিলেন। জেনারেল সার আর্থার ওয়েলেসলি আগাই ও অর্গাইয়ের যুদ্ধে এবং জেনারেল লেক দিল্লী ও লাসোরারীর যুদ্ধে—গায়কওয়াড়, সিদ্ধিয়া ও ভোঁস্লার মাথা নত করিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের কতকাংশ ইংরাজদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, বাকী অংশে করত রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু হোল্কার তখনও পৃথক থাকিয়া ব্রিটিশ শক্তিকে ভুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন। কর্ণেল মন্সনের সেনাদলকে মধুরা ও আত্রা তিনি নাকালের একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দ্বীঘ্‌নগরের (ভরতপুরের নিকট) যুদ্ধে হোল্কার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ভরতপুরের সামন্ত রাজা হোল্কারের সহিত বোস দিয়াছিলেন বলিয়া, ইংরাজরা

তঁাহার রাজধানীও আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তরতলুরের অধির  
দুর্গ কোন কৌশলেই হস্তগত করিতে না পারিয়া, রাজ্যের সহিত  
বিস্তি করিলেন। পরে হোলকারের অধিকারের অধিকাংশ রাজ্য  
স্বাধীন করিয়া, ইরোজগণ বাকী সামান্য অংশে হোলকারকে করদ  
রাজ্যরূপে থাকিতে দিলেন। এই দ্বিতীয় প্রস্থ মারাঠাযুদ্ধের  
কালে ইরোজদের ভারতে প্রভুত্ব-স্থাপনের পথ-পরিষ্কার হইল।

পেশওয়া দ্বিতীয় বালাজীর জন্মে ক্রমে সুবৃদ্ধির উন্নয়  
হইল,—কিন্তু বড় মেরোতে। ইরোজদের রাজ্য-লোভ  
সাংঘাতিক রকমের বাড়িতেছে দেখিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া  
উঠিলেন। ইরোজরা তঁাহাকে কখন প্রবেশ ও করেকটি  
দুর্গ ছাড়িয়া দিতে অমুরোধ করায়, তিনি বুঝিতে পারিলেন  
যে, ইহাদের সর্বপ্রাণী ক্ষুধার নিকট তঁাহারও নিষ্ঠার নাই।  
বালাজী গোপনে তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে উচ্ছেদ করিতে  
মনস্থ করিলেন। ২৬ হাজার মারাঠা সৈন্য একদিন কিকর  
রথক্ষেত্রে ইরোজদিগকে আক্রমণ করিল (১৮৭৮ খ্রষ্টাব্দ)। কিন্তু  
ভাগ্যলক্ষী বিরূপ! পেশওয়া পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইলেন।  
সমগ্র মহারাষ্ট্র-ভূমি ইরোজদের অধিকারে আসিল। দ্বিতীয়  
বালাজীরাও আট লক্ষ টাকাও বৃত্তি পাইয়া, কাশ্মীরের নিকট  
বিশুয়ে নজরবন্দী হইয়া, বাকী জীবনটুকু কাটাইলেন।

আত্মা সাক্ষ্যে ভোঁসলা শূন্যরাজ্য স্বাধীনতা ফিরাইয়া  
আমিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নাথপুর ও গীতাবল্লীর  
কুহু তঁাহারা আশাতরুও চিরতরে নিশ্চূল হইয়া গেল। ১৮৮৩

খুঁটাতে অপূত্রক অবস্থার তাঁহার স্বভূ হওয়ার, তাঁহার পুত্র রাজ্যটি ইংরাজরা খাশ করিয়া লইলেন। এইরূপে শিবাজী— স্বাধীনতার যে স্বপ্নকুণ্ড একদিন ভৈরব ভেঙ্গে ছালাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দুইশত বৎসরের মধ্যে গৃহ-বিবাদের অজস্র বারিপাতে নির্ধাপিত হইয়া গেল।

তারপর ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে আর একবার মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের একটু সাড়া জাগিয়াছিল। কিন্তু সকলের মধ্যে নয় এবং ভালো করিয়াও নয়। ঐ সালে সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারত ব্যাপিয়া যে প্রকাণ্ড সিপাহী-বিদ্রোহ ঘর, তাহার মোটামুটি বিবরণ ভোমরা মূলপাঠ, ইতিহাসে পড়িয়াছ; বড় হইয়া বিস্তৃত ইতিহাস পড়িয়া দেখিয়াও। এই বিদ্রোহের অধি বাঁহারা ছালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই মহারাষ্ট্র জাতীয়। ইহাদের মধ্যে নানা সাহেব ছিলেন প্রধান। দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পুত্র ছিলেন এই নানা সাহেব। বাজী-রাওয়ের স্বভূর পর ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার পুত্র নানা সাহেবকে কোনরূপ বৃত্তি দিতে চাহিলেন না দেখিয়া, নানা সাহেবের হইল ইংরাজদের উল্লস ভীষণ জাতক্রোধ। তিনি তলে তলে দেশীয় সিপাহীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে খেপাইয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহারই পরামর্শে নাকি কানপুরে নানা বহুসংখ্যক শত শত ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষকে উত্তেজিত সিপাহীরা নির্হরভাবে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহ যখন হইয়া গেলে, নানা সাহেবকে আর হুঁজিরা পাওয়া যায় নাই।

এই সূত্রে আর একজনের নাম না করিলে চলিবে না।



তিনি কানীর স্নায়ী লক্ষ্মীবাঈ ; ইনি ছিলেন কানীর রাজ্য  
 প্রবাসের রাণার পত্নী ; বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই ইনি  
 অপূত্রক অবস্থার বিধবা হন । বসাবরের মৃত্যুর পর ইংরাজ  
 শাসনকর্তা লর্ড ডালহাউসি স্নায়ী লক্ষ্মীবাঈকে পোষাপুত্র  
 রাখিতে না দিয়া, কানী রাজ্য জোর করিয়া কাড়িয়া লন ।  
 বিধবা স্নায়ীর কোন আপত্তি টিকে নাই ; বোর-জবরদস্তিতেও  
 তিনি ইংরাজের সহিত পারিলেন না । সেই ক্ষণে তিনিও পরম  
 শত্রুরূপে সিপাহী-বিদ্রোহে বোগ দিয়াছিলেন । একমল বিদ্রোহী  
 সিপাহী লক্ষ্মীবাঈ ইনি নিজে বোড়ার চড়িয়া যুদ্ধে নামিলেন ।  
 তাঁহার অমৃত সাধক অমৃত্যু ডেক ও যুদ্ধ-চালনা করিবার  
 অপূর্ণ কৌশল দেখিয়া শত্রুপক্ষও স্তম্ভিত হইয়া পিয়াছিল । যুদ্ধ  
 করিতে করিতেই এই বীর নারীর মৃত্যু হয় । তাঁহার বয়স তখন  
 তুড়ি বৎসর মাত্র । সিপাহী-বিদ্রোহের আর একজন বড় নেতা  
 ছিলেন তান্তিয়া চৌপী । তিনিও একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ ।

বাহাউক, একশত বৎসরের উপর ইংরাজদের অধীনে  
 আসিয়া, মারাঠা জাতি একেবারে নিবীৰ্য্য, পঙ্গু হইয়া  
 যায় নাই । ইংরাজ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে নূতন  
 শিকা ও সভ্যতার প্রদীপ জ্বালাইয়া নিরাছেন, তাহার আলোক  
 নুতন করিয়া তাহার আধীনতার পড়া মুরু করিয়াছে । গত  
 পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্র, রাণাড়ে, ডিল্ল, মোবিলে,  
 কেস্কার, সেশপাণ্ডে, ঞপর্কের মত বহু সুসজ্জিত প্রদেশ  
 নিজে দখল হইয়াছে—ভারতকে দখল করিয়াছে

